HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০১ আরোহ অনুমান

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: অবরোহ অনুমানের প্রকারভেদ
টপিক ০২: আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ
টপিক ০৩: আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি
টপিক ০৪: আরোহের কূটাভাস
টপিক ০৫: কারণ ও শর্ত
টপিক ০৬: কারণের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৭: বহুকারণবাদ
টপিক ০৮: কার্য-সংমিশ্রণ
টপিক ০৯: আরোহের বস্তুগত ভিত্তি
টপিক ১০: নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

টপিক ০১: আরোহ অনুমান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আরোহ অনুমান

অনুমানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি আরোহ অনুমান ও অপরটি অবরোহ অনুমান। আরোহ অনুমানে আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক বাক্যকে সিদ্ধান্ত রূপে অনুমান করি। সুতরাং সিদ্ধান্তটি সব সময়েই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক। অনুমানের গতি এখানে ঊর্ধ্বমুখী। এ অধ্যায়ে আমরা আরোহ অনুমানের প্রকৃতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

আমরা এ বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছি। অবরোহ অনুমানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তির আকারগত সত্যতা নিরূপণ করা। বস্তুগত সত্যতা নিয়ে এখানে বড় একটা মাথা ঘামানো হয় না। অনুমানের নিয়ম-কানুনগুলো ঠিকমত অনুসরণ করলে এবং সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হলে অবরোহ অনুমানের একটি যুক্তিকে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। আমরা দেখেছি যে, একটি যুক্তি আকারগতভাবে সত্য হলে তা সব সময় বস্তুগতভাবে সত্য নাও হতে পারে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল।

সকল ছাত্র হয় মানুষ।

... সকল ছাত্র হয় মরণশীল।

অবরোহ অনুমানের এ যুক্তিটিতে সংশ্লিষ্ট অনুমানের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে। তাই যুক্তিটি আকারগতভাবে সত্য। আবার, যুক্তিটিতে ব্যবহৃত আশ্রয়বাক্যগুলো এবং তাদের থেকে অনুমিত সিদ্ধান্তটির সাথে বাস্তব জগতের মিল বা সঙ্গতি আছে। তাই যুক্তিটি বস্তুগতভাবেও সত্য। কিন্তু নিম্নের যুক্তিটিতে ব্যাপারটি একটু অন্য রকমের। যেমন-

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

সকল মানুষ হয় ধনী।
সকল ভিক্ষুক হয় মানুষ।
...সকল ভিক্ষুক হয় ধনী।

অবরোহ অনুমানের এ যুক্তিটিতে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন ঠিকমতই অনুসরণ করা হয়েছে। তাই যুক্তিটি আকারগতভাবে সত্য। কিন্তু যুক্তিটি বস্তুগতভাবে সত্য নয়। এর প্রথম আশ্রয়বাক্য 'সকল মানুষ হয় ধনী' বস্তুগতভাবে মিথ্যা। ফলে এর থেকে অনুমিত সিদ্ধান্ত-'সকল ভিক্ষুক হয় ধনী' বস্তুগতভাবে মিথ্যা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটি যুক্তির আকারগত সত্যতা নির্ভর করে অনুমানের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করবার উপর। আর বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে আশ্রয়বাক্যগুলোর বাস্তব সত্যতার উপর।

সত্যতা এক ও অখণ্ড। আকারগত সত্যতা ও বস্তুগত সত্যতা একই সত্যতার দু'টি ভিন্ন দিক মাত্র। তাই যে কোন একটি যুক্তিকে যথার্থ হতে হলে তাকে আকারগত এবং বস্তুগত উভয়ভাবেই সত্য হতে হবে। অবরোহ অনুমানে আমরা লক্ষ্য করি অনুমানের নিয়মগুলো সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে কিনা এবং সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে নিয়মসঙ্গতভাবে অনুমিত হয়েছে কিনা। যদি একটি যুক্তি অনুমান সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলে; অর্থাৎ তাতে যদি রূপগত সত্যতা থাকে, তাহলে আমরা যুক্তিটিকে বৈধ বলে মনে করি।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

অবরোহ অনুমানে যে সব আশ্রয়বাক্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তাদের বাস্তব সত্যতা পরীক্ষা বা প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয় না। এসব যুক্তিবাক্য কিভাবে পাওয়া যায়, এদের সত্যতাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এদের সত্যতার সাথে বাস্তব জগতের কোন সঙ্গতি আছে কিনা এসব প্রশ্ন আমরা তলিয়ে দেখি না। কিন্তু যুক্তিবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাকেই অর্জন করা। তাই আমরা কেবল অনুমানের নিয়ম-কানুনের উপরই নির্ভর করতে পারি না। আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হলেই সিদ্ধান্তকে সত্য বলে ধরে নিতে পারি না। আমাদের দেখা দরকার সিদ্ধান্তটিতে বস্তুগত সত্যতা আছে কি না। বস্তুত সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতার উপর। আশ্রয়বাক্যগুলো যদি বাস্তবের সাথে সভঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং সিদ্ধান্তটি যদি তাদের থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই সত্য হয়। সুতরাং পূর্ণ সত্যতাকে অর্জন করতে হলে অবরোহ অনুমানে ব্যবহৃত আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতা নিরূপণ করবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আর এ প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আরোহ অনুমান।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

অবরোহ অনুমানে যে সব আশ্রয়বাক্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) সার্বিক যুক্তিবাক্য, (২) বিশেষ যুক্তিবাক্য এবং (৩) বিশিষ্ট বা একক যুক্তিবাক্য। বিশিষ্ট ও বিশেষ যুক্তিবাক্যের বস্তুগত সত্যতা নির্ধারণ করা তেমন কঠিন কাজ নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যেই তাদেরকে বাস্তবের সাথে যাচাই করে দেখা যায়। কিন্তু সার্বিক যুক্তিবাক্যের বস্তুগত সত্যতা নির্ণয় করা একটি সমস্যার ব্যাপার। আমরা জানি যে, প্রতিটি সহানুমানের যুক্তিতে কমপক্ষে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য থাকে। কাজেই এরূপ যুক্তিবাক্যের বস্তুগত সত্যতা নিরূপণের একটা উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যকীয়।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হয়, তাহলে তার সত্যতা প্রমাণ করবার কোন দরকার করে না। এগুলোকে আমরা বিনা প্রমাণেই সত্য বলে স্বীকার করে নেই। আবার কোন সার্বিক যুক্তিবাক্য যদি বিশ্লেষক হয়, তাহলেও তার সত্যতা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা নেই। বিশ্লেষক যুক্তিবাক্যের বিধেয় তার উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশবিশেষকে উল্লেখ করে। এ জাতীয় যুক্তিবাক্যের সত্যতা পরীক্ষার জন্য অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়ার কোন দরকার পড়ে না। যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলেই যদি তার মধ্যে বিধেয়কে পাওয়া যায়, তাহলেই যুক্তিবাক্যটি যথার্থ হবে। কিন্তু সার্বিক যুক্তিবাক্য যদি সংশ্লেষক হয়, তাহলে কি করে তার বস্তুগত সত্যতা প্রমাণ করা যাবে? সার্বিক যুক্তিবাক্যের মধ্যে যেগুলো ব্যাপকতার দিক থেকে সংকীর্ণতর সেগুলোকে প্রমাণ করবার কোন অসুবিধা নেই।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

এ ধরনের বাক্যকে অধিকতর ব্যাপক সার্বিক যুক্তিবাক্যের সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করে তার সত্যতাকে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এভাবে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন থেকে যায় সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য বিশেষ করে যেগুলো অসংখ্য অগণিত ব্যক্তি বা বস্তুকে ইঙ্গিত করে, সেগুলোর বস্তুগত সত্যতা কী করে নির্ণয় করা যায়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, একমাত্র আরোহ অনুমানের সাহায্যেই সার্বিক যুক্তিবাক্যকে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা হয়। অবরোহ অনুমানে যে সব সার্বিক যুক্তিবাক্যকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় আরোহ অনুমানে তাদের বস্তুগত সত্যতাকে প্রমাণ করা হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আরোহের সমস্যা হচ্ছে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যের বস্তুগত সত্যতা নিরূপণ করা।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

এ সত্যতা নিরূপণ করতে যেয়ে আমাদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত সবগুলো বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। তাই বিশেষ করে কয়েকটি ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই আমাদেরকে সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করতে হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনা পরীক্ষা করে কোন সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করাকে বলে সার্বিকীকরণ। আরোহের প্রধান সমস্যা হলো কোন্ যুক্তিতে বা কোন্ শর্তে আমরা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার জ্ঞান থেকে সমষ্টির জ্ঞানে পদার্পণ করতে পারি তা নির্ণয় করা। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেও সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। আবার কোন ক্ষেত্রে একটি বা দু'টি দৃষ্টান্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করেই নিশ্চয়তার সাথে সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যুক্তিবিদ মিল আরোহের সমস্যা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরোহের সমস্যা হলো কোন্ শর্তে এবং কোন্ অবস্থায় এবং কেমন করে বিশিষ্ট ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা যায় তা নির্ণয় করা।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

আরোহ অনুমানে আমরা কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা কিছু থেকে সমগ্রে, নিরীক্ষিত থেকে অ-নিরীক্ষিত ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিক বাক্যে পদার্পণ করি। এখানে মুষ্টিমেয় বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে বিরাট একটি লম্ফ দিয়ে একবারে সমজাতীয় সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এখানে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তের ব্যবধান ও দূরত্ব অনেক বেশি। তাই প্রশ্ন জাগে; মাত্র কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে আমরা কিভাবে সমগ্র দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে কোন বক্তব্য প্রকাশ করতে পারি? যুক্তিবিদেরা মনে করেন যে, আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে গমনের পূর্বে বিজ্ঞানের দু'টি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, যথা-প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করলে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যকার বিরাট ব্যবধানটি অতিক্রম করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজতর হয়।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের ধারণা

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসারে প্রকৃতি একইরূপ পরিস্থিতিতে সব সময় একইভাবে আচরণ করে। আর কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ঘটনারই কোন একটি কারণ আছে। বিনা কারণে কোন কিছুই ঘটে না। একজন মানুষের মৃত্যু ঘটলে আমরা বুঝতে পারি এর নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে। আবার আমরা এটাও ধারণা করি যে, আজ যে কারণে একটি লোকের মৃত্যু ঘটলো সেই একই কারণে ভবিষ্যতে আরও অনেক লোকের মৃত্যু ঘটবে। তাই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে দুই চার জন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সকল মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারটি অনুমান করি এবং 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এ সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করি। যেহেতু প্রকৃতি সব সময়ই নিয়মানুবর্তী এবং প্রকৃতির সব ঘটনাই কার্য-কারণ নিয়মে আবদ্ধ সেহেতু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐ ধরনের সার্বিক যুক্তিবাক্যের বস্তুগত সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা

কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করবার পদ্ধতিকে আরোহ বলে।

আরোহ অনুমানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাস্তব জগতের কতিপয় বিশিষ্ট ঘটনা সম্মন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি তার উপর নির্ভর করে কোন একটি গোটা শ্রেণী বা জাতি সম্মন্ধে প্রযোজ্য এরূপ একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করি। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান খুবই সীমিত। কোন সার্বিক বাক্যের অন্তর্গত সমুদয় ক্ষেত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা একই জাতীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে যে জ্ঞান পাই তাকেই সমুদয় দৃষ্টান্তের বেলায় সত্য বলে ধরে নেই। এভাবে কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সমজাতীয় সকল বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার নাম আরোহ।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা

আরোহ অনুমানে আমরা কিছু থেকে সমগ্রে, জানা থেকে অজানায় এবং নিরীক্ষিত বস্তু বা ঘটনা থেকে অ-নিরীক্ষিত বস্তু বা ঘটনায় পদার্পণ করি। অনুমানের গতি এখানে ঊর্ধমুখী। কেননা, এরূপ অনুমানে আশ্রয়বাক্যগুলো বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত সার্বিক যুক্তিবাক্য। উদাহরণ স্বরূপ-

কামাল হয় মরণশীল।
জামাল হয় মরণশীল।
বিমল হয় মরণশীল।
সালমা হয় মরণশীল।
.. সকল মানুষ হয় মরণশীল।

এক্ষেত্রে আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে কামাল, জামাল প্রমুখ ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু সম্মন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। অবশ্য এ জ্ঞান খুবই সীমিত। কেননা-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব মানুষের মৃত্যু সম্মন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা কখনই কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে কতিপয় মানুষের মৃত্যুর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সমগ্র মানব জাতির মরণশীলতা সম্মন্ধে একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করি।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা

যুক্তিবিদ্যার ইতিহাস ঘাটলে আরোহানুমান সম্মন্ধে যুক্তিবিদদের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার সম্মান পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

* ১। "আরোহ হচ্ছে মনের সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা অনুমান করি যে, যাকে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য বলে জানি তা সব ক্ষেত্রেই সত্য হবে। যাদের কিছু নিরূপণযোগ্য বিষয়ে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের সাথে মিল থাকে।"- মিল

২। "আরোহ হল বিশেষ থেকে সার্বিক অথবা কম ব্যাপক থেকে বেশি ব্যাপক বাক্যের একটি ন্যায়সঙ্গত অনুমান।"- ফাউলার

৩। "ঘটনাবলী নিরীক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে পৌঁছানোকেই আরোহ বলে।"-বেন

৪। "আরোহ বলতে আমরা বুঝি এমন একটি অনুমান যেখানে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আমরা সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে পদার্পণ করি।" -কার্ডেথ রীড

৫। "বিশেষ ঘটনাসমূহের ভিত্তিতে সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়াকে আরোহ বলে।" – জয়েস

৬। "বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সার্বিক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার সারধর্মকে আরোহ বলে।"৬- যোসেফ

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা

বিভিন্ন যুক্তিবিদ প্রদত্ত আরোহের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আরোহ হচ্ছে অনুমানের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষ কিছু বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। এতে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার জগত থেকে প্রথমে বিশেষ দৃষ্টান্তগুলো সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তার ভিত্তিতে একটি সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময় দু'টি মূল পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। এরা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়ম। যেমন- মানুষের মৃত্যু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার একটি নিদর্শন। মৃত্যুর ঘটনাগুলো একইরূপ নিয়মের অনুসারী। তবে কোন মৃত্যুই বিনা কারণে ঘটে না। প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনার পিছনেই যথাযথ কারণ থাকে। তাই আরোহ অনুমানে বিশেষ বিশেষ মৃত্যুর ঘটনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে এবং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় আস্থা এনে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এ সার্বিক সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, কতিপয় বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কোন সার্বিক সত্য বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার পদ্ধতিকেই বলে আরোহ অনুমান। তাই আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তটি সব সময়ই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য

অনুমান প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে আরোহ অনুমান। এর মধ্যে নিম্নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলো একে অবরোহ অনুমান থেকে পৃথক করে রাখে।

(১) আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সব সময়ই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক।

আরোহ অনুমান হচ্ছে কিছু থেকে সকলে গমনের একটি প্রক্রিয়া। এতে আমরা কতিপয় বিশিষ্ট ধারণা থেকে শুরু করে একটি সার্বিক ধারণায় গমন করি। অনুমানের গতি এখানে উর্ধমুখী। এর আশ্রয়বাক্যগুলো বিশিষ্ট বা বিশেষ যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। অর্থাৎ এর সিদ্ধান্ত সবক্ষেত্রেই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক।

(২) আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য।

আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তরূপে যে বাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য, বিশেষ যুক্তিবাক্য নয়। একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি তার উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের উপর আরোপিত হয়। এরূপ অনুমানে আমরা কিছু মানুষকে মরতে দেখে সকল মানুষের মৃত্যু সম্মন্ধে অনুমান করি অর্থাৎ 'মরণশীলতা', গুণটিকে সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে স্বীকার করে-'সকল মানুষ হয় মরণশীল'-এ সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করি।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য

(৩) আরোহ অনুমান বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে।
আরোহ অনুমানে যে সার্বিক সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয় তা নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের উপর। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এ বাস্তব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যেমন-রহিম, করিম, প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করি।

(৪) আরোহ অনুমানে একটি আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান থাকে।
আরোহ অনুমানে আমরা কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে পদার্পণ করি, আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কতিপয় জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায় যাওয়া, বিশেষ থেকে সার্বিকে এবং কম ব্যাপক থেকে বেশি ব্যাপক সিদ্ধান্তে উত্তরণকে বলে আরোহমূলক লম্ফ।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য

(৫) আরোহ অনুমান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে। আরোহ অনুমানে আমরা গুটি কয়েক বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে-কিসের ভিত্তিতে আমরা এভাবে কতিপয় থেকে সমুদয়ে পৌঁছাতে পারি? জবাবে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানের একটি মৌলিক নিয়ম যথা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করি। এ নীতির অর্থ হল-প্রকৃতি নিয়মের অনুসারী। অর্থাৎ প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একইভাবে কাজ করে। আরোহের সিদ্ধান্ত স্বাপনের পূর্বে আমরা যখন কতিপয় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি তখন আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা অনুসারে বিশ্বাস করি যে, প্রকৃতি চিরদিন একই রূপে মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং ঘটাতে থাকবে। তাই আমরা মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারি।

আরোহ অনুমান বিজ্ঞানের আর একটি মৌলিক নিয়ম যথা- কার্য-কারণ নিয়মের উপরও নির্ভর করে। এ নিয়মের অর্থ হলো-প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ আছে। কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটতে পারে না। মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। এ কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা' এর মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এরই ভিত্তিতে আমরা সকল মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করতে সক্ষম হই।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য

(৬) আরোহ অনুমান বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।
আরোহ অনুমানে আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অনুমানের আশ্রয়বাক্য সংগ্রহ করি এবং তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এর আশ্রয়বাক্যগুলো বস্তুগতভাবে সত্য বলে এর সিদ্ধান্তও বস্তুগত সত্যতার দাবি করে। অবরোহ অনুমানের মত আরোহ অনুমানের নিজস্ব তেমন কোন নিয়ম-কানুন নেই। তবে বিজ্ঞানের দু'টি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যথা- (১) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও (২) কার্য-কারণ নিয়মের উপর আরোহ অনুমানের নির্ভরতা আছে বলে এবং এর আশ্রয়বাক্যগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত হয় বলে এরূপ অনুমান আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই সত্য হয়।'

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

আরোহ অনুমানের প্রধান লক্ষ্য হলো ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে বিশেষ ঘটনা থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা। কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার অর্থ হলো কোন জানা কার্যের কারণ আবিষ্কার করা অথবা কোন জানা কারণের কার্য আবিষ্কার করা। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলী খুবই জটিল। এদের একটির মধ্যে অন্যটি মিলেমিশে ঘটে বা অবস্থান করে। কাজেই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারলেই এ ব্যাপারে সফলতা অর্জন করা যায়। যুক্তিবিদরা তাই আরোহ অনুমানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিম্নের স্তর বা ধাপগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

১। সংজ্ঞা (Definition):

কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আমরা যে বিষয়টিকে বেছে নেই প্রথমেই তার একটি সংজ্ঞা দিয়ে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ তার সম্বন্ধে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তাকে তালগোল পাকিয়ে না ফেলি। কোন বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বিজ্ঞানে সংজ্ঞা দানকে উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন-আমরা যদি ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে প্রথমেই এ রোগটি কি এবং এর মধ্যে কি কি লক্ষণ বিদ্যমান তা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার যাতে আমরা ভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে মাথা না ঘামাই। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করবার পূর্বে এর একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করা দরকার।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

২। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ (Observation and Analysis):

এর পরে আসে নির্বাচিত বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের অর্থ হলো সুনিয়ন্ত্রিত বা উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ। নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ই পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা নির্বাচিত বিষয়টি উপস্থিত এরূপ কিছু কিছু দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে আসি। তাদের উপর অনুসন্ধান কাজ চালাই। নির্বাচিত ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার আগের এবং পরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করি। তবে ঘটনাবলী প্রকৃতিতে খুবই জটিল অবস্থায় থাকে। তাই কাজের সুবিধার্থে জটিল ঘটনাকে সরল অংশসমূহে ভাগ করে তাদের মধ্যে কোন্টি প্রয়োজনীয় আর কোন্টিন্ট অপ্রয়োজনীয় তা নির্ধারণ করা দরকার। একেই বলে বিশ্লেষণ। এ স্তরে আমরা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করি। এ রোগের সাথে যুক্ত বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এর অগ্রবর্তী ও অনুবর্তী ঘটনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং রোগটির সাথে মশার কামড়, জলাভূমি, বনজঙ্গল, পচা নর্দমা, রোগীর বয়স, কু-অভ্যাস, নেশা, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ের যোগাযোগ লক্ষ্য করি। তারপর এগুলোর মধ্যে কোন্টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্টি অপ্রয়োজনীয় তা বুঝে নেওয়ার জন্য তাদেরকে সরল আকারে বিশ্লেষণ করি। অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করি।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

৪। প্রকল্প প্রণয়ন (Framing of Hypothesis) :

এবার হচ্ছে প্রকল্প প্রণয়নের পালা। নির্বাচিত ঘটনার পক্ষে প্রয়োজনীয় এরূপ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে আমরা যে-কোন একটিকে নির্বাচিত ঘটনার কারণ বলে আন্দাজ করি এবং অন্যগুলোকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখি। এরূপ সাময়িক আন্দাজ করাকে বলে প্রকল্প প্রণয়ন। কারণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-ম্যালেরিয়া রোগের সাথে যে সব বিষয়কে সব সময়ই উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে যে কোন একটি রোগের কারণ হতে পারে। এরূপ অবস্থায় আমরা বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অর্থাৎ মশার কামড়কে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ বলে আন্দাজ করি। যুক্তিবিদ তুইওয়েল প্রকল্প প্রণয়নকে আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলে মনে করেন।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

৫। সার্বিকীকরণ (Generalisation) :

এর পরের স্তর হলো সার্বিকীকরণ। আমাদের কল্পিত কারণটিকে যদি নিরীক্ষিত দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরও কিছু কিছু নতুন ক্ষেত্রে সমভাবে কাজ করতে দেখা যায়, তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, কারণটি সব ক্ষেত্রেই একই ভাবে কাজ করবে। এভাবে বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উপর কোন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করাকে বলে সার্বিকীকরণ। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মশার কামড় থেকে ম্যালেরিয়া রোগ সংঘটিত হতে দেখি এবং এর - থেকে সিদ্ধান্ত করি যে সকল ক্ষেত্রেই মশার কামড় হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। যুক্তিবিদ মিল-এর মতে এটিই হচ্ছে আরোহের শেষ স্তর।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

৬। পরীক্ষামূলক সমর্থন (Verification) :

আমাদের প্রতিষ্ঠিত সার্বিক সিদ্ধান্তটি যথার্থ হলো কিনা এবং এর সাহায্যে প্রতিটি বিশিষ্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি না তা নিরূপণ কররার জন্য সিদ্ধান্তটিকে পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করা দরকার। যুক্তিবিদ ফাউলার বলেন, সমর্থন কোন নতুন প্রমাণ নয়। এটা হল এক প্রমাণ দিয়ে অন্য প্রমাণকে যাচাই করা। সমর্থন দু'প্রকার, যথা-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ সমর্থনে আমরা বাস্তব ঘটনাবলী দিয়ে সিদ্ধান্তটিকে যাচাই করি। আর পরোক্ষ সমর্থনে অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সার্বিক সিদ্ধান্তটিকে বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সেটি কার্যকরী হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করি অথবা সিদ্ধান্তটি থেকে আর একটি ধারণা অনুমান করে তাকে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখি। যদি কার্যকরী হয় বা বাস্তবের সাথে মিলে যায়, তাহলে সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হয়েছে বলে মনে করি। মশার কামড়কে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হিসেবে গ্রহণ করবার পর একে পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করা দরকার। এ সমর্থন দু'ভাবে হতে পারে। আমরা যদি দেখি যে বাস্তব জগতে যাদের মশায় কামড়াচ্ছে তারাই এ রোগে ভুগছে তাহলেই সিদ্ধান্তটি প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত হবে। আবার যারা মশারী ব্যবহার করছে অর্থাৎ যাদের মশায় কামড়াতে পারছে না তারা এ রোগে ভুগছে না, তাহলে সিদ্ধান্তটি পরোক্ষভাবে সমর্থিত হবে। যুক্তিবিদ জেভন্স-এর মতে আরোহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর হচ্ছে পরীক্ষামূলক সমর্থন।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন ধাপের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative Importance of the Stages of Inductive Procedure):

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর বা ধাপের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যুক্তিবিদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তারা সবাই এ স্তরগুলোর সংখ্যা সম্মন্ধেও একমত নন। যুক্তিবিদ বেকন আরোহ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপের মধ্যে বিশ্লেষণ ও অপনয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে আরোহের সাফল্য নির্ভর করে বিশ্লেষণ ও পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে অবান্তর বিষয়ের অপনয়নের উপর। অনুসন্ধান কাজ চালানোর সময় অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে অপনয়ন করতে না পারলে আমাদের পক্ষে সফলতার সাথে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অপরদিকে যুক্তিবিদ তুইওয়েল প্রকল্প প্রণয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে আরোহ অনুমান ঘটনা সংযোজন ছাড়া আর কিছুই নয়। আরোহ অনুমানের সাফল্য নির্ভর করে নিরীক্ষিত ঘটনাবলীকে একত্রীকরণ করে কারণ সম্মন্ধে যথাযথভাবে একটি প্রকল্প প্রণয়নের উপর।

আরোহ অনুমান

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর

তিনি মনে করেন প্রকল্প প্রণয়নের পর আরোহ অনুমানের আর কিছুই বাকী থাকে না। প্রকল্প প্রণয়ন আর সিদ্ধান্ত স্থাপন আসলে একই কথা। আবার, যুক্তিবিদ মিল আরোহের বিভিন্ন ধাপগুলোর মধ্যে সামান্যীকরণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে আরোহ অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা। এ ব্যাপারে প্রকল্প প্রণয়নের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে আরোহ অনুমানে একবারেই সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়। তিনি মনে করেন যে সামান্যীকরণই হচ্ছে আরোহ পদ্ধতির শেষ স্তর। পুনরায়, যুক্তিবিদ জেভন্স আরোহ পদ্ধতির শেষ স্তর অর্থাৎ পরীক্ষামূলক সমর্থনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থিত না হলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হয় না। আরোহের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থিত হওয়ার পরই তা একটি সার্বিক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভকরে। সুতরাং পরীক্ষামূলক সমর্থন হচ্ছে আরোহের সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

আরোহ অনুমান

আরোহের প্রয়োজনীয়তা

আরোহ অনুমানে আমরা বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে একটি সার্বিক ধারণায় উপনীত হই। যুক্তিবিদদের মতে শুধুমাত্র সার্বিক ধারণা প্রতিষ্ঠার খাতিরেই নয়, আমাদের বাস্তব জীবনে চলার পথেও আরোহ অনুমানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। নিম্নে আরোহের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত, আরোহ অবরোহ অনুমানের সার্বিক আশ্রয়বাক্যগুলো সরবরাহ করে। অবরোহ অনুমানে আমরা সার্বিক যুক্তিবাক্য থেকে বিশেষ যুক্তিবাক্য, অথবা বেশি ব্যাপক সার্বিক যুক্তিবাক্য থেকে কম ব্যাপক সার্বিক যুক্তিবাক্য অনুমান করি। অবরোহ অনুমানে যে সব সার্বিক যুক্তিবাক্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তাদের সত্যতাকে প্রমাণ করবার কোন চেষ্টা করা হয় না। আরোহ অনুমানের কাজ হচ্ছে এ সব সার্বিক যুক্তিবাক্যের সত্যতাকে আবিষ্কার ও প্রমাণ করা। অবরোহ অনুমানে ব্যবহৃত সার্বিক যুক্তিবাক্যগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যক যুক্তিবাক্যই স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে স্বীকৃত। এদের অধিকাংশ যুক্তিবাক্যই আরোহ অনুমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আরোহ অনুমান

আরোহের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয়ত, যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যতাকে অর্জন করা। আমরা জানি যে সত্যতা দু' প্রকারের, যথা-রূপগত সত্যতা ও বস্তুগত সত্যতা। কিন্তু আসলে সত্যতা এক অখন্ড জিনিস। রূপগত ও বস্তুগত সত্যতা এর দু'টি ভিন্ন দিক মাত্র। যার মধ্যে এ উভয় দিকই বর্তমান সেটিই প্রকৃত সত্য। অবরোহ আমাদেরকে কেবল রূপগত সত্যতা দিতে পারে। বস্তুগত সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণ সত্যতাকে অর্জন করবার জন্য প্রয়োজন আরোহ অনুমানের।

তৃতীয়ত, আরোহ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথকে সুগম করে। বিজ্ঞান প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠার সময় আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে। বৈজ্ঞানিকদের অনুঃসৃত পদ্ধতি হচ্ছে আরোহ পদ্ধতি। কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরোহ পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর যথা-পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, সামান্যীকরণ ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ আরোহ বিজ্ঞান সাধনার পদ্ধতি সরবরাহ করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজকে সহজতর করে।

আরোহ অনুমান

আরোহের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থত, আরোহ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য ও শৃঙ্খলার বিষয়টি প্রকাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃতি অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও আকস্মিকতায় ভরপুর। কিন্তু আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃতির ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় যে প্রকৃতি একটি নিয়মের রাজত্ব। এখানে প্রতিটি ঘটনাই কার্য-কারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিনা কারণে কোন কিছুই ঘটে না। প্রকৃতিতে আকস্মিকতার কোন বালাই নেই। প্রকৃতি একই পরিস্থিতিতে সব সময় একইরূপ আচরণ করে।

পঞ্চমত, আরোহ সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার ও প্রমাণের মাধ্যমে আমাদেরকে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের কাজে সহায়তা করে। আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা লাভের পর সেটিই আবার ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের যাত্রাবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

ষষ্ঠত, আরোহ মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই কিছু কিছু কুসংস্কার তাদের মনে দানা বেঁধে থাকে। আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে বাস্তব ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করবার সময় আমরা প্রকৃতির নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অবহিত হই। প্রকৃতিতে ঘটনাবলী কিভাবে ঘটে সে সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এর ফলে অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত ঘটনাবলী সম্মন্ধে আমাদের বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরে। আমরা এগুলো থেকে মুক্তি লাভ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০২ আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

টপিক ০২: আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

আরোহের প্রকারভেদ

আরোহের প্রকারভেদ আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ মিল কর্তৃক প্রদর্শিত প্রকারভেদই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি আরোহ অনুমানকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- ১। প্রকৃত আরোহ (Induction Proper) এবং ২। অপ্রকৃত আরোহ বা তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ (Induction improperly so called)। মিলের' মতে, যেসব আরোহ প্রক্রিয়ার-মধ্যে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান তাদেরকে প্রকৃত আরোহ বলে। আর যে সব আরোহ প্রক্রিয়া দেখতেই শুধু আরোহের মত, কিন্তু তাদের মধ্যে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তাদেরকে অপ্রকৃত আরোহ বা তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ বলে।

মিল এরপর প্রকৃত আরোহকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।যথা-

১। বৈজ্ঞানিক আরোহ

২। অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং

৩। সাদৃশ্যানুমান।

তিনি আবার অপ্রকৃত আরোহকেও তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা-

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহ

২। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ এবং

৩। ঘটনা সংযোজন।

আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

আরোহের প্রকারভেদ

সুতরাং আরোহ সর্বমোট ছয় প্রকার; যথা-১। বৈজ্ঞানিক আরোহ, ২। অবৈজ্ঞানিক আরোহ, ৩। সাদৃশ্যানুমান, ৪। পূর্ণাঙ্গ আরোহ, ৫। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ এবং ৬। ঘটনা সংযোজন। নিম্নে একটি ছকের আকারে আরোহের প্রকারভেদ দেখানো হলো:

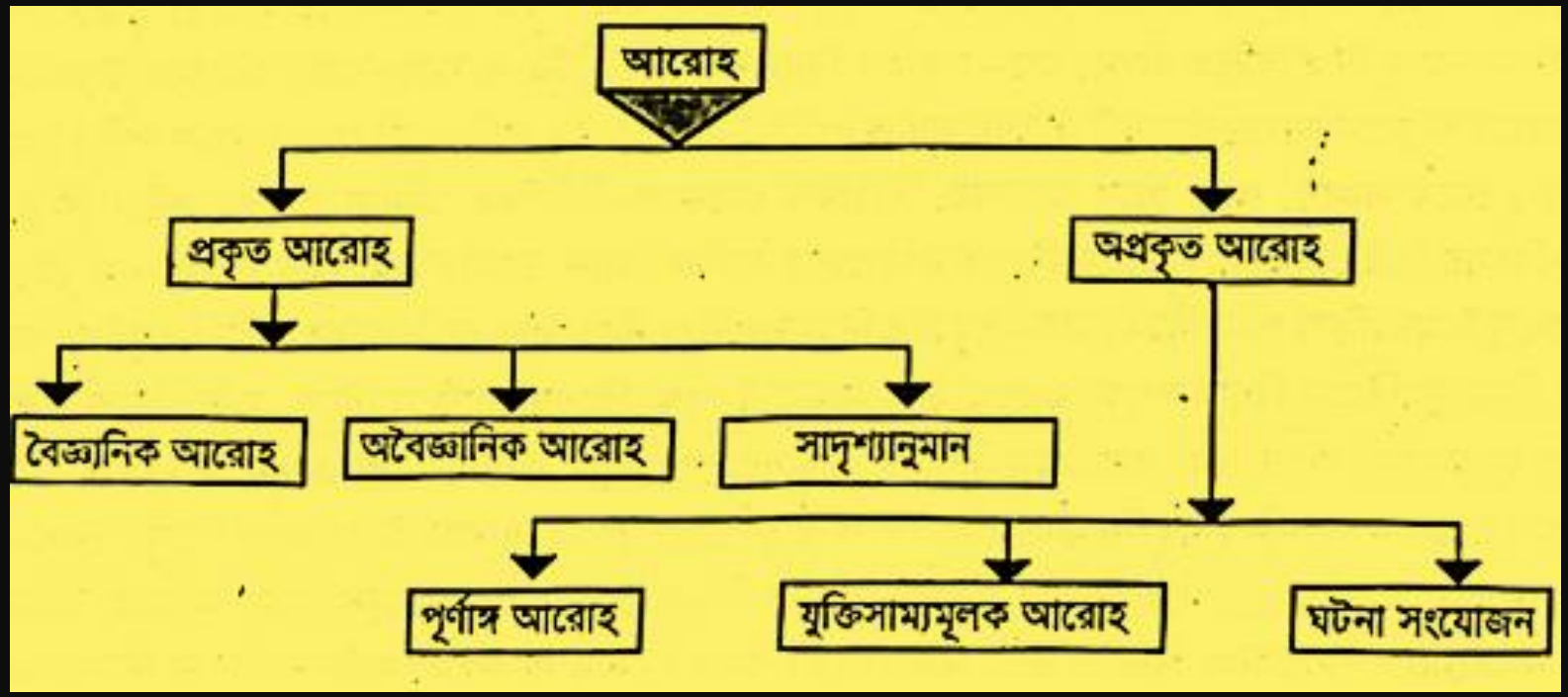

আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

আরোহের ভিত্তি

আরোহের ভিত্তি বলতে আমরা সেসব প্রক্রিয়াকে বুঝি যাদের উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমান সম্ভব করে তোলা হয়। আরোহ অনুমানের লক্ষ্য হলো আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাকে অর্জন করা। আরোহের প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো-অনুমানের নিয়মগুলো ঠিকমত অনুসরণ করা হলো কিনা এবং দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো-অনুমানের বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব জগতের মিল বা সংগতি আছে কিনা। আরোহ অনুমানে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করি এবং বিজ্ঞানের দু'টি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। ফলে সিদ্ধান্তটি আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই সত্য হয়। এ দুই প্রকার সত্যতাকে অর্জন করবার জন্য আরোহের দু'টি পৃথক ভিত্তি আছে। এ ভিত্তি দু'টির নাম আকারগত ভিত্তি ও বস্তুগত ভিত্তি। সুতরাং আরোহের ভিত্তি দু'প্রকার, যথা-

আরোহের ভিত্তি ও প্রকারভেদ

আরোহের ভিত্তি

১। আকারগত ভিত্তি এবং ২। বস্তুগত ভিত্তি।

আরোহের আকারগত ভিত্তি বলতে আমরা বুঝি এমন কয়েকটি মৌলিক নিয়ম যাদের উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়।

আর আরোহের বস্তুগত ভিত্তি বলতে আমরা এমন কয়েকটি প্রক্রিয়াকে বুঝি যারা আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো সরবরাহ করে এবং সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

আরোহের আকারগত ভিত্তি হলো-প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম। কেননা, এ দু'টি নিয়মকে অনুসরণ করেই আরোহের সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। আর আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হলো-নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। কেননা, এরা উভয়ই আমাদেরকে আরোহের আশ্রয় বাক্যগুলো সরবরাহ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৩ আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

টপিক ০৩: আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

আরোহের আকারগত ভিত্তি

আরোহের আকারগত ভিত্তি বলতে আমরা বুঝি এমন কয়েকটি মৌলিক নিয়ম যেগুলোর উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়।

আরোহ অনুমানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকারগত ও বস্তুগত সত্যতা অর্জন করা। আকারগত সত্যতা অর্জনের জন্য আরোহ বিজ্ঞানের দু'টি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, যথা-প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে। আরোহ অনুমানে আমরা কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অ-নিরীক্ষিত ঘটনায় পদার্পণ করি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে-কিসের ভিত্তিতে আমরা এভাবে বিশেষ জ্ঞান থেকে সার্বিক জ্ঞানে উপনীত হই? উত্তরে বলা যায় যে, এর ভিত্তি হচ্ছে দুটি স্বতঃসিদ্ধ পরম নিয়ম, যথা- প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়ম।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

আরোহের আকারগত ভিত্তি

প্রকৃতির আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস-স্বাপন করবার ফলে আমাদের পক্ষে বিশেষ থেকে সার্বিকে, জানা থেকে অজানায় গমন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে, আরোহের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে দু'টি ঘটনার মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। কার্য-কারণ নিয়মটিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলেই এ কাজটি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আরোহ অনুমানে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য নিজস্ব কোন নিয়ম-কানুন নেই। আরোহ প্রক্রিয়া এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক নিয়মের উপর নির্ভর করে। কাজেই সে দু'টি নিয়ম, যথী-প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়ম হচ্ছে আরোহের আকারগত ভিত্তি।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি আরোহ অনুমানের অন্যতম আকারগত ভিত্তি। এখন আমরা এ নীতিটির অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

(ক) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অর্থ :

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি একটি মৌলিক নিয়ম। কাজেই এর সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়। তবে নানা জনে একে নানাভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন। যেমন- 'প্রকৃতি হয় নিয়মানুবর্তী', 'প্রকৃতি নিজের পুনরাবৃত্তি করে', 'প্রকৃতি নিয়মের দাস', 'ভবিষ্যৎ অতীতের অনুরূপ হবে', 'একই কারণ থেকে একই ফল ঘটে', 'প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত্ব' ইত্যাদি। এ সব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি অর্থই পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রকৃতি একই রূপ পরিস্থিতিতে সব সময় একই ভাবে আচরণ করে। যদি একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে প্রকৃতিতে একই রূপ ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-যে সব অবস্থায় আগুন অতীতে দহন করেছে সে সব অবস্থায় আগুন ভবিষ্যতেও দহন করবে। আবার, যে সব অবস্থায় অতীতে ভূমিকম্প হয়েছে সে সব অবস্থায় ভবিষ্যতেও ভূমিকম্প হবে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রকৃতি একটি নিয়মের রাজত্ব। প্রকৃতির সব কিছুই নিয়ম-কানুনের মধ্যে বাঁধা। এখানে খামখেয়ালী বা আকস্মিকতার কোন স্থান নেই।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

(খ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির প্রকৃতি:

প্রকৃতির-নিয়মানুবর্তিতা নীতি একটি সার্বিক নিয়ম। বিশ্বজগতের মধ্যে যা কিছু আছে এবং যা কিছু ঘটে সবই এ নিয়মের অধীন। এ নীতিটি অনুসারে জগতের সবকিছু ধারাবাহিকভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে ঘটে যাচ্ছে। জগতের কোন কিছুর পক্ষেই এ সর্বব্যাপক নিয়মের বাইরে অবস্থান করা সম্ভব নয়। ফলে জগতের বা প্রকৃতির সার্বিক কাজকর্ম ও গতিবিধি সব সময় একইরূপে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকৃতির সামগ্রিক রূপ অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে।

প্রকৃতির এ সমরূপতা থেকে আমাদের বোঝা উচিত নয় যে, প্রকৃতিতে কোন বৈচিত্র্য নেই। প্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতি অপরূপ বৈচিত্র্যে ভরপুর। এর প্রতিটি ভিন্ন ঘটনাই এক একটি ভিন্ন কারণের সাথে যুক্ত। যুক্তিবিদ মিল বলেন, "এ বছরে যেমন বৃষ্টিপাত ও চমৎকার আবহাওয়া পাওয়া গেল পরবর্তী বছরগুলোতে ঠিক তেমন বৃষ্টিপাত ও চমৎকার আবহাওয়া পাওয়া যাবে-একথা কেউই বিশ্বাস করে না। কেউই প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখবার প্রত্যাশা করে না। বস্তুত প্রকৃতির ঘটনা প্রবাহ শুধু একানুবর্তীই নয়, বরং সীমাহীন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।"১ কার্ডেথ রীড বলেন, "বহু দিক দিয়েই প্রকৃতিকে নিয়মানুবর্তী বলে মনে হয় না। বস্তুসমূহের আকার, গঠন, বর্ণ ও অন্যান্য গুণের অন্তহীন তারতম্য রয়েছে, বায়ু ও আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে, বাণিজ্য ও রাজনীতির উত্থান-পতন বিস্ময়ে ভরপুর।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতিতে নানা ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা যেমন- ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ঘটতে দেখা যায়। এসব দেখে-শুনে আমাদের মনে হয় না যে, প্রকৃতিতে কোন নিয়ম-কানুন আছে।' তবে এ ধরনের বিচিত্র ও আকস্মিক ঘটনার উপস্থিতি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির পরিপন্থী নয়। এ নীতির বক্তব্য এ নয় যে, প্রকৃতিতে কোন বিচিত্র ঘটনা ঘটবে না অথবা প্রকৃতিতে সব সময় একই ধরনের ঘটনা ঘটবে। নীতিটির মূলকথা হচ্ছে-প্রকৃতিতে যত ধরনের ঘটনাই ঘটুক না কেন তারা সবই প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের অধীন। প্রকৃতিতে বিচিত্র ঘটনা ঘটবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে এখানে যে-কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

আমরা জানি যে, এ জগৎ পরিবর্তনশীল। এখানে হুবহু একই প্রকারের কারণের পুনরাবৃত্তি বড় একটা হয় না। তাই প্রকৃতিতে বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যে পরিমাণ নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কোন স্থানে একদিন যে আকারে ঘূর্ণিঝড় হয় ঠিক সে পরিমাণে নিম্নচাপ সৃষ্টি না হওয়ার ফলে সে স্থানে অন্যদিন সে আকারের ঘূর্ণিঝড় হয় না। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঠিক একই রূপ থাকলে প্রকৃতিতে সব সময় একই রূপ ঘটনা ঘটতে বাধ্যা যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতীতে ভূমিকম্প, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি ঘটেছে সে অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলে ভবিষ্যতেও আবার ভূমিকম্প, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি ঘটবে।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

যুক্তিবিদ বেন-এর মতে, প্রকৃতিতে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন নিয়ম। তাই তিনি বলেন, "প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এক নয়, বহু।" প্রকৃতির এক একটি বিভাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে বিজ্ঞানের এক একটি শাখা। প্রতিটি শাখাই তার নিজস্ব বিভাগের ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণায় রত। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি শাখাই কিছু কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যেমন-পদার্থ বিজ্ঞান শাখা মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত, প্রাণিবিজ্ঞান শাখা বংশগতির নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এবং রসায়ন বিজ্ঞান শাখা নির্দিষ্ট অনুপাতের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

তবে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকলেও এ বিভাগগুলো একে অপর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। এরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতি হচ্ছে পরস্পর সংযুক্ত অংশসমূহের একটি সমষ্টি। এখানে অংশ সমগ্র দ্বারা এবং সমগ্র অংশ দ্বারা পরিচালিত। এর বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন নিয়ম থাকলেও তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ সব ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম একই অখণ্ড নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিবিদ ওয়েলটন-এর মতে প্রকৃতি হচ্ছে এক অখণ্ড সমষ্টি। এর বিভিন্ন বিভাগের ঘটনাবলী ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে নয়, বরং একটি মাত্র সার্বিক নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি। তাই তিনি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতাকে প্রকৃতির ঐক্য নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতির ঐক্য বলতে আমরা বুঝি না যে, বিশ্বপ্রকৃতি একটি অপরিবর্তনীয় সমষ্টি, বরং এর দ্বারা আমরা বুঝি যে, প্রকৃতি হচ্ছে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্তা যা তার অংশসমূহের অন্তহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও সমগ্র হিসেবে নিজেকে অপরিবর্তিত রাখে।"

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রকৃতি হচ্ছে একটি নিয়মের রাজত্ব। এখানে সবকিছুই নিয়ম-কানুন অনুসারে ঘটে। প্রকৃতি হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে একানুরূপ, বিভেদের মধ্যে ঐক্য। প্রকৃতি একটি বিশৃঙ্খলা নয়, বরং একটি শৃঙ্খলা।

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

(গ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির সাথে আরোহের সম্বন্ধ:

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহের একটি রূপগত ভিত্তি। আরোহ অনুমানে আমরা কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা কিছু থেকে সমগ্রে, জানা থেকে অজানায় পদার্পণ করি। কিন্তু প্রশ্ন হল: কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা এভাবে বিশেষ জ্ঞান থেকে সার্বিক জ্ঞানে উপনীত হই? এর একটি ভিত্তি হলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর আমাদের বিশ্বাস। এ নিয়মের উপর নির্ভর করবার ফলেই মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে আমাদের পক্ষে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃতি একই রূপ পরিস্থিতিতে সব সময় একইভাবে কাজ করে। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমরা সহজেই জানা থেকে অজানায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন করতে পারি। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় আস্থা আছে বলেই আমরা কয়েকজন মানুষের মৃত্যু লক্ষ্য করে সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করতে পারি। তাই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে আরোহের রূপগত ভিত্তি বলা হয়। নাটকে বীরকম এক চিমটির গান

আরোহের আকারগত ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি

(ঘ) প্রকৃতির ঐক্য (Unity of Nature):

এ প্রকৃতিতে বিভিন্ন বিভাগ আছে। বিভিন্ন বিভাগের ঘটনাবলী ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকলেও এ বিভাগগুলো একে অপর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। এরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতি হলো পরস্পর সংযুক্ত অংশসমূহের একটি সমষ্টি। এখানে অংশ সমগ্র দ্বারা পরিচালিত। এর বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন নিয়ম থাকলেও তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ সব ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম একই অখণ্ড নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিবিদ ওয়েলটনের মতে প্রকৃতি হচ্ছে এক অখণ্ড সমষ্টি। এর বিভিন্ন বিভাগের ঘটনাবলী ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে নয়, বরং একটি মাত্র সার্বিক নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত, সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি। তাই তিনি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতাকে প্রকৃতির ঐক্য নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতির ঐক্য বলতে আমরা বুঝি না যে বিশ্বপ্রকৃতি একটি অপরিবর্তনীয় সমষ্টি, বরং এর দ্বারা আমরা বুঝি যে প্রকৃতি হচ্ছে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্তা যা তার অংশসমূহের অন্তহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও সমগ্র হিসেবে নিজেকে অপরিবর্তিত রাখে।" সুতরাং প্রকৃতি হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে একানুরূপ বিভেদের মধ্যে ঐক্য। প্রকৃতি একটি বিশৃংখলা নয়, বরং একটি শৃঙ্খলা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৪ আরোহের কূটাভাস

টপিক ০৪: আরোহের কূটাভাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আরোহের কূটাভাস

যুক্তিবিদ মিল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটিকে আরোহের রূপগত ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, এ নীতির উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানে বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তিনি আবার নীতিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, নীতিটি নিজেই একটি আরোহের দৃষ্টান্ত। একে আমরা অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ বা অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠা করি। মিল মনে করেন যে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করি। যেমন-আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আগুন সব সময়ই দহন করে, খাবার ক্ষুধা নিবারণ করে, পানি পিপাসা দূর করে, তাপ দিলে বরফ গলে যায়, সার দিলে ফসল ভাল হয়, বসন্তে গাছে গাছে ফুল ফোটে ইত্যাদি কত কিছু। এর কোন ব্যতিক্রম কখনও চোখে পড়ে না। প্রকৃতির আচরণ সম্বন্ধে আমাদের এ অবাধ ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসি যে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেই নিয়মানুবর্তিতা বর্তমান। তাই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে ধারণা আমাদের অবাধ অভিজ্ঞতারই ফল। অর্থাৎ নীতিটি অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের মাধ্যমেই 'প্রাপ্ত।

আরোহের কূটাভাস

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মিলের মতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি অবৈজ্ঞানিক আরোহের ফলস্বরূপ। আবার এ নীতিটি 'সকল প্রকার আরোহ অনুমানের আকারগত ভিত্তি। কেননা, সকল প্রকার আরোহ অনুমানই এ নীতির উপর নির্ভর করে বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করে। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি সম্পর্কে মিলের ব্যাখ্যায় দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। যেমন-(১) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত এবং (২) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সকল আরোহ অনুমানের ভিত্তি। এরূপ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি যে আরোহ অনুমানের ভিত্তি, সে আরোহ অনুমানেরই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আরোহের ভিত্তিটি নিজেই একটি আরোহ। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে মিল যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা স্ব-বিরোধী এবং অসঙ্গত। তাই এ মতবাদকে বলা হয় আরোহের কূটাভাস বা আপাত অসঙ্গত মতবাদ।

'কূটাভাস' কথাটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি বক্তব্য যাকে আপাত দৃষ্টিতে অসঙ্গত বলে মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা বাস্তব সত্যই প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি সম্পর্কে যুক্তিবিদ মিল যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত হলেও তার মধ্যে বাস্তব সত্যতা নিহিত আছে।

আরোহের কূটাভাস

আরোহের কূটাভাসের সমালোচনা

যুক্তির মাধ্যমে পর্যালোচনা করলে আরোহের কূটাভাস মতবাদ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রথমত, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে মিলের বক্তব্যের মধ্যে চক্রকযুক্তির অনুপপত্তি (Fallacy of Petitio Principii) দেখা দেয়। মিল মনে করেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি হচ্ছে প্রকৃত আরোহের একটি ভিত্তি। এ ধরনের প্রতিটি আরোহেই আমরা নীতিটির উপর নির্ভর করে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে গমন করি। তিনি আবার বলেন যে, এ নীতিটিই আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তরূপে অনুমিত হয়। অর্থাৎ নীতিটি একাধারে আরোহের ভিত্তি এবং আরোহের ফল। কিন্তু একই বিষয় একই সঙ্গে কোন কিছুর ভিত্তি ও ফল হতে পারে না। যাকে আরোহের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয় অর্থাৎ যার উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানকে সম্ভব করে তোলা হয়, তা নিজে আবার কি করে আরোহের সিদ্ধান্তরূপে আসতে পারে একথা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

আরোহের কূটাভাস

আরোহের কূটাভাসের সমালোচনা

দ্বিতীয়ত, মিলের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি একদিকে নিশ্চিত সত্য এবং অন্যদিকে সম্ভাব্য সত্য প্রকাশ করে। আমরা জানি যে, অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ বা অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি যদি অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের সিদ্ধান্তরূপে আসে, তাহলে নীতিটিও হবে সম্ভাব্য। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সব সময়ই নিশ্চিত বলে বিবেচিত। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি যদি বৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তিরূপে কাজ করে, তাহলে তাকেও নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মিল নীতিটির উৎপত্তির দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে সম্ভাব্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এরূপ একটি সম্ভাব্য নীতিকেই তিনি আবার বৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তি বলে প্রচার করেছেন। তাই বিষয়টি খুব গোলমেলে। একটি সম্ভাব্য জিনিস কখনই নিশ্চিত জিনিসের ভিত্তি হতে পারে না।

আরোহের কূটাভাস

আরোহের কূটাভাসের সমালোচনা

তৃতীয়ত, মিল একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ হিসেবে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রাপ্ত। তার মতে নানাবিধ অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে আমরা এ নীতিটিকে অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করি। কিন্তু আসলে এ নীতিটি একটি মৌলিক নিয়ম। এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতই নিশ্চিত। এর দ্বারা অনেক কিছুর সত্যতাই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এর নিজের সত্যতা প্রমাণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই এরূপ একটি মৌলিক নিয়মকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের সিদ্ধান্তরূপে ধারণা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সুতরাং আরোহের কূটাভাস একটি বিভ্রান্তিকর মতবাদ। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি যথার্থই আরোহের রূপগত ভিত্তি। এর উপর নির্ভর না করে আরোহের আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৫ কারণ ও শর্ত

টপিক ০৫: কারণ ও শর্ত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কারণ ও শর্ত

কারণের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে যার দ্বারা কোন ঘটনা ঘটে তাকে কারণ বলে। এ জগৎ গতিশীল এবং এর মধ্যে বস্তু ও ঘটনা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন কেন এবং কিভাবে হচ্ছে তার উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা কারণের সন্ধান পাই। কারণ হলো এমন কিছু যা বস্তুর পরিবর্তন, গতি বা ক্রিয়ার জন্য দায়ী। সাধারণ-মানুষের মতে কারণের মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে যার প্রভাবে একটি বস্তুর পরিবর্তন হয় বা একটি ঘটনার উৎপত্তি হয়।

যুক্তিবিদ্যায় কারণ বলতে আমরা এমন একটি ঘটনাকে বুঝি যা কার্য নামক অপর একটি ঘটনার সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত। সময়ের বিবেচনায় কারণ আগে আসে। তাই কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা। আর কার্য পরে আসে। তাই কার্য পরবর্তী ঘটনা।

যুক্তিবিদ মিল কারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "যদি কোন পূর্ববর্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীর সংমিশ্রণের পর অন্য একটি ঘটনা অনিবার্যভাবে এবং শর্তহীনভাবে অনুগমন করে তাহলে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং অনুবর্তী ঘটনাকে কার্য বলে।”

কারণ ও শর্ত

কারণের সংজ্ঞা

মিলকে অনুসরণ করে যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড কারণের একটি মনোজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে, "গুণের দিক দিয়ে কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত, শর্তহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরিমাণের দিক দিয়ে কারণ হলো কার্যের সমপরিমাণ।"২ উদাহরণস্বরূপ, একজন লোক সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করল। এখন সর্প দংশন পূর্ববর্তী ঘটনা এবং মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা। এ দু'টি ঘটনা একে অপরের সাথে অনিবার্য ও শর্তহীন সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই এক্ষেত্রে সর্প দংশন হচ্ছে মৃত্যুর কারণ।

কারণ ও শর্ত

কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক

কোন কার্যকে ঘটানোর জন্যে যে সব পূর্ববর্তী, ঘটনার প্রয়োজন তাদের সমষ্টিকে বলা হয় কারণ। এ সমষ্টির প্রতিটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কার্যকে উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। এ ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে এক একটি শর্ত বলে।

প্রকৃতপক্ষে, কারণ একটি সরল ঘটনা নয়। একটি কারণকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একাধিক অপরিহার্য অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সব অপরিহার্য অংশগুলো একত্রিত হলে একটি মিলিত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ মিলিত ক্রিয়াকেই বলা হয় কারণ। আর কারণের ঐ সমস্ত অপরিহার্য অংশকে বলা হয় শর্ত। সুতরাং কারণ হলো কতকগুলো শর্তের সমষ্টি এবং শর্ত হল কারণের এক একটি অপরিহার্য অংশ। যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীডের ভাষায় "কারণ কখনই সরল নয়, বরং তাকে বিভিন্ন শর্তে বিশ্লেষণ করা যায় এবং শর্ত হলো কারণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ।"

কারণ ও শর্ত

কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক

কারণের শর্তগুলোকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা-সদর্থক শর্ত (positive condition) ও নঞর্থক শর্ত(negative condition)। যে শর্তের উপস্থিতি কার্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাকে সদর্থক, শর্ত বলে। আর যে শর্তের অনুপস্থিতি কার্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাকে নঞর্থক শর্ত বলে।
কার্ডেথ রীড বলেন, "কার্যকে নস্যাৎ না করে যে শর্তকে বাদ দেওয়া যায় না তাকে সদর্থক শর্ত বলে; কার্যকে নস্যাৎ না করে যে শর্তকে উপস্থাপন করা যায় না তাকে নঞর্থক শর্ত বলে।"১ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন কার্যকে উৎপাদন করতে হলে সদর্থক শর্তাবলীর উপস্থিতি এবং নঞর্থক শর্তাবলীর অনুপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কার্য উৎপাদনের পক্ষে সদর্থক শর্তগুলো অনুকূল অবস্থা এবং নঞর্থক শর্তগুলো প্রতিকূল অবস্থা প্রদান করে। ফলে কোন কারণের সদর্থক শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকলে এবং নঞর্থক শর্তগুলো উপস্থিত থাকলে ঐ কারণের পক্ষে কোন প্রকারেই কার্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কার্য উৎপাদনের জন্যে সদর্থক শর্তগুলোর প্রত্যক্ষ এবং নঞর্থক শর্তগুলোর পরোক্ষ অবদান থাকে। তাই উভয় প্রকার শর্তই কারণের অংশ হিসেবে গণ্য হয়।

কারণ ও শর্ত

কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক

উদাহরণস্বরূপ, নদীতে নৌকাডুবির ফলে একটি শিশুর মত্যু হলো। এক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছে কার্য। এর কারণ হিসেবে আমরা অনেকগুলো শর্তের সন্ধান পাই যেগুলো কার্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে। এদের মধ্যে ঝড়ো বাতাস, তীব্র জলস্রোত, পানির ঘূর্ণিপাক, অত্যধিক বোঝাই ইত্যাদি হচ্ছে সদর্থক শর্ত। কেননা এদের উপস্থিতির ফলে নৌকা ডুবিতে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। অপরপক্ষে, মাঝির পারদর্শিতা, শিশুটির সাঁতার জ্ঞান, উদ্ধারকারী কোন নৌকা, ভাসমান কোন পদার্থ ইত্যাদি হচ্ছে নঞর্থক শর্ত। কেননা এগুলোর অনুপস্থিতির ফলেই শিশুটির মৃত্যু সম্ভব হয়েছে। সুতরাং শিশুটির মৃত্যুর ব্যাপারে সদর্থক শর্তগুলোর প্রত্যক্ষ ও নঞর্থক শর্তগুলোর পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

কারণ ও শর্ত

কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক

আমরা অনেক সময় একটিমাত্র সদর্থক শর্তকে কোন কার্যের কারণ বলে ধরে নেই। এরূপ একটি শর্ত আমাদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করে যে, আমরা তাকেই কারণ বলে গ্রহণ করি অন্য কোন শর্তের কথা বেমালুম ভুলে যাই। যেমন-একটি ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে আমরা হয়ত বলি যে, পরীক্ষার কয়দিন আগে জ্বর হওয়াই ছেলেটির ফেল করবার কারণ। বস্তুত ফেল করবার পিছনে অনেকগুলো সদর্থক শর্ত কাজ করতে পারে, যথা- পড়াশুনায় অবহেলা করা, পরীক্ষার পূর্বে জ্বর হওয়া, প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়া, হলে কড়াকড়ি করা, প্রশ্নের ভুল উত্তর দেওয়া, পরীক্ষক কর্তৃক চেপে নম্বর দেওয়া, পাসের হার কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে জ্বর হওয়া একটি মাত্র শর্ত। কাজেই একে সমগ্র কারণ বলে চিহ্নিত করা যায় না। আবার, আমরা অন্য কোন সময় হয়ত একটি নঞর্থক শর্তকেই সমগ্র কারণ বলে ভুল করি। যেমন-একটি লোক হাটের ভীড়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এখানে তার মৃত্যুর সদর্থক শর্তগুলো হচ্ছে শারীরিক দুর্বলতা, অত্যধিক পরিশ্রম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, গরম আবহাওয়া ইত্যাদি। আর নঞর্থক শর্তগুলো হচ্ছে মাথায় পানি দেওয়া, ওষুধ ও পথ্য খাওয়ানো, বাতাস দেওয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে, মাথায় পানি না দেওয়াই লোকটির মৃত্যুর কারণ, তাহলে একটি মাত্র নঞর্থক শর্তকে সমগ্র কারণ বলে ভুল করা হবে।

কারণ ও শর্ত

কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কারণ হলো সদর্থক ও নঞর্থক শর্তগুলোর সমষ্টি। কারণ ও শর্তের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে সমগ্র ও অংশের মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ। একটি শর্ত হলো কারণের একটি অংশ এবং একটি কারণ হলো সবগুলো শর্তের সমষ্টি। যুক্তিবিদ মিল যথার্থই বলেছেন, "কারণ হলো সদর্থক ও নঞর্থক শর্তসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমষ্টি।”

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি কারণের অন্তর্গত সদর্থক শর্তগুলোর সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু নঞর্থক শর্তের সংখ্যা সীমিত নয়। কাজেই তাদের সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল কার্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এমন কয়েকটিকে সদর্থক শর্তের কথা উল্লেখ করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৬ কারণের বৈশিষ্ট্য

টপিক ০৬: কারণের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কারণের বৈশিষ্ট্য

যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড প্রদত্ত কারণের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে কারণের কয়েকটি গুণগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

১। কারণ হলো কার্য নামক একটি ঘটনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

কারণ ও কার্য দু'টি সাপেক্ষ পদ। এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই কার্য ছাড়া কোন কারণ এবং কারণ ছাড়া কোন কার্য হতে পারে না। কোন ঘটনাই নিজে নিজে কারণ নয়, বা নিজে নিজে কার্য নয়। প্রকৃতিতে কার্য বা কারণকে আলাদাভাবে ভাগ করে দেখানো যায় না। একই ঘটনা কোন সময় কারণ আবার কোন সময় কার্যরূপে গণ্য হতে পারে। যেমন-একটি লোক বিষপান করে মারা গেল। এখানে বিষপান হচ্ছে কারণ এবং মৃত্যু হচ্ছে তার কার্য। আবার এ বিষপানকেই আমরা একটি কার্য হিসেবে গণ্য করতে পারি। তখন হয়ত দেখা যাবে পারিবারিক কলহ বিষপানের কারণ।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

২। কারণ হলো কোন বিশেষ কালের ঘটনা।

কাল প্রবাহমান। কালের গতিতে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তিত হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় কার্য কোন নতুন ঘটনা নয়। কার্য হচ্ছে কারণেরই একটি পরিবর্তিত অবস্থা। প্রকৃতিতে বিভিন্ন সময় বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটছে। বস্তুর এ রূপান্তরকে আমরা কার্য-কারণ নিয়মের আকারে ব্যাখ্যা করি। প্রকৃতিতে যখনই কোন পরিবর্তন ঘটে তখনই আমরা প্রশ্ন তুলি এর কারণ কি? আর সাথে সাথেই আমরা কারণটি আবিষ্কার করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠি। যেমন-কোন একটি স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, সে স্বানে পূর্বে একরূপ অবস্থা ছিল এবং পরে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

৩। কারণ হলো কোন নির্দিষ্ট স্বানের ঘটনা।

কারণ একটি বাস্তব ঘটনা। বাস্তব জগতে অহরহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এদের মধ্যে একটি ঘটনা প্রভাব খাটিয়ে অন্য একটি ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। প্রকৃতিতে এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে এবং সেটা আমাদের জানবার প্রয়োজন হলে আমরা তার অবস্থানের দিকটি লক্ষ্য করি এবং স্থান বা দেশের নিরীখে তার ব্যাখ্যা দান করি। সুতরাং কার্য উৎপাদনের জন্য একটি কারণ সব সময়ই কোন নির্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

৪। কারণ হলো কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা।

কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক হলো ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক। সময়ের বিবেচনায় কারণ সব সময় আগে আসে এবং কার্য সব সময় পরে আসে। অর্থাৎ কারণ হলো পূর্ববর্তী বা অগ্রগামী ঘটনা এবং কার্য হলো পরবর্তী বা অনুগামী ঘটনা। যেমন-বাস দুর্ঘটনায় একটি লোকের পা ভেঙ্গে গেল। এখানে বাস দুর্ঘটনাকে আমরা কারণ বলি কেননা ঘটনাটি আগে ঘটে। আর পা ভাঙ্গাকে আমরা কার্য বলি কেননা ঘটনাটি পরে ঘটে। অর্থাৎ বাস দুর্ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পা ভাঙ্গা পরবর্তী ঘটনা।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

৫। কারণ হলো অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা।

কারণ একটি পূর্ববর্তী ঘটনা। কিন্তু যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা চলে না। পূর্ববর্তী ঘটনা পরিবর্তনীয় অথবা অপরিবর্তনীয় হতে পারে। যে ঘটনাকে কোন কোন সময় কার্যের আগে দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় না তাকে পরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা বলে। আর যে ঘটনাকে সব সময়ই কার্যের আগে দেখা যায় তাকে অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা বলে। কারণ হতে হলে কোন ঘটনাকে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় হতে হবে। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই কার্যের আগে ঘটতে হবে। পরিবর্তনীয় কোন ঘটনাকে কোন কার্যের কারণ বলা যায় না। যেমন-মশার কামড় সব ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়ার আগে ঘটে। এর কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অর্থাৎ মশার কামড় ম্যালেরিয়া রোগের একটি অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। সুতরাং মশার কামড়ই ম্যালেরিয়ার কারণ।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

উল্লেখ্য, যে-কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ ও কার্মের মধ্যে একটা অনিবার্য সম্পর্ক থাকে। তাই কারণ কোন পরিবর্তনীয় ঘটনা হতে পারে না। কোন পরিবর্তনীয় ঘটনাকে কারণ বলে ধারণা করলে কাকতালীয় অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়। যেমন- ধূমকেতুর উদয়কে রাজার মৃত্যুর কারণ হিসেবে গণ্য করলে এরূপ অনুপপত্তি দেখা দেয়। কেননা, ধূমকেতুর উদয় একটি পরিবর্তনীয় ঘটনা। রাজার মৃত্যুর সাথে এর কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। এটি একটি আকস্মিক ঘটনামাত্র।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের গুণগত বৈশিষ্ট্য

৬। কারণ হলো শর্তহীন পূর্ববর্তী ঘটনা।

যুক্তিবিদ মিলের মতে নিছক অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা চলে না। কারণ হতে হলে তাকে অবশ্যই শর্তহীন হতে হয়। কারণ যদি শুধু অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা হয়, তাহলে দিনকে রাতের কারণ, জোয়ারকে ভাঁটার কারণ অথবা বিদ্যুৎকে বজ্রধ্বনির কারণ বলতে হয়। কেননা দিন সব সময়ই রাতের আগে আসে। জোয়ার সব সময়ই ভাঁটার আগে আসে। বিদ্যুৎ সব সময়ই বজ্রধ্বনির আগে আসে। কিন্তু আসলে এদের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দিন ও রাত পরস্পর অপরিবর্তনীয় ঘটনা। কিন্তু এরা একে অপরের কারণ বা কার্য নয়। কেননা এদের পিছনে একটি শর্ত রয়েছে। শর্তটি হচ্ছে-পৃথিবীর আবর্তন ও তার উপর সূর্যরশ্মির পতন। এটি হচ্ছে দিন ও রাত উভয়ের কারণ। অনুরূপভাবে, বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনির কারণ নয়। এদের পিছনে অন্য একটি শর্ত কাজ করে। মেঘের ঘর্ষণের ফলেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি উভয়ের উৎপত্তি ঘটে। তাই মেঘের ঘর্ষণ হচ্ছে বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি উভয়ের কারণ। সুতরাং যে পূর্ববর্তী ঘটনা বিনা শর্তে অনিবার্যভাবে কার্য উৎপন্ন করে সেটিই হচ্ছে কারণ।

কারণের বৈশিষ্ট্য

৭। কারণ হলো অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা।

একটি কার্যের অনেকগুলো পূর্ববর্তী ঘটনা থাকতে পারে। তাদের মধ্যে কোনটি কার্যের নিকটবর্তী এবং কোনটি কার্যের দূরবর্তী। এগুলোর মধ্যে যেটি কার্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী সেটিই হবে কারণ। কারণ সরাসরি কার্য উৎপন্ন করে। তাই কোন দূরবর্তী ঘটনাকে কারণ বলা যায় না। কার্য ও কারণের মধ্যে তৃতীয় ঘটনা থাকবে না। কারণ হবে কার্যের অব্যবহিত ঘটনা। যদি কোন ঘটনা কার্যকে উৎপন্ন করবার জন্য অন্য কোন ঘটনার অপেক্ষায় থাকে তাহলে সেটি অব্যবহিত নয় আবার শর্তহীনও নয়। এরূপ ঘটনাকে কারণ বলা চলে না। যেমন-মেঘ কাপড় ভেজার কারণ হতে পারে না। কেননা এটি কাপড় ভেজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়। আমরা জানি যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি থেকে কাপড় ভেজে। সুতরাং বৃষ্টি হচ্ছে কাপড় ভেজার কারণ। কেননা বৃষ্টি হওয়ার পরপরই কাপড় ভেজে অথবা কাপড় ভেজার কেবলি আগে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হচ্ছে কাপড় ভেজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা।

কারণের এ লক্ষণটিকে অগ্রাহ্য করে কোন দূরবর্তী ঘটনাকে কোন ঘটনার কারণ বলে গ্রহণ করলে কার্যকারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে। যেমন-নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানকে তার পতনের কারণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। কেননা, রাশিয়া অভিযান নেপোলিয়নের পতনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়। এটি একটি দূরবর্তী ঘটনা। এ ঘটনা কখনই কারণ হতে পারে না।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

পরিমাণের দিক দিয়ে কারণ ও কার্য সমপরিমাণ। কারণের মধ্যে যে বস্তু ও শক্তি নিহিত থাকে তার পরিমাণ কার্যের বস্তু ও শক্তির পরিমাণের সাথে সমান। পরিমাণের এ সমতার বিষয়টিকে দু'টি নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়-

১। বস্তুর অবিনশ্বরতা নিয়ম (Law of Conservation of Matter) :

এ নিয়ম অনুসারে এক প্রকারের বস্তু অন্য প্রকারের বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। বস্তুর আকৃতি, গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু বস্তুর পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তাই বিশ্ব জগতের বস্তুর সামগ্রিক পরিমাণ সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকে। যেমন-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে একসাথে মিশালে পানি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ গ্যাস দু'টি পরস্পর মিলনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে তাদের রূপের পরিবর্তন ঘটলেও তাদের পরিমাণের কোন তারতম্য হয় না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলিত ওজন আর পানির ওজন সমানই থাকে। সুতরাং বস্তুর দিক দিয়ে কারণ ও কার্যের পরিমাণ সব সময়ই এক থাকে। শুধুমাত্র আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

২। শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম (Law of Conservation of Energy):

এ নিয়ম অনুসারে এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। শক্তির রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু শক্তির পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই বিশ্ব জগতের সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ সব সময়ই এক ও অভিন্ন। যেমন-বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে এবং আলোক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ এক প্রকার শক্তি পরিবর্তিত হয়ে অন্য প্রকার শক্তিতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে শক্তির রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র। তাদের পরিমাণের কোন তারতম্য ঘটে না। বস্তুত এক প্রকার শক্তি লোপ পেয়ে অন্য প্রকার শক্তির উদ্ভব ঘটায়। একটি গতিশীল বস্তু থেমে গেলে আমরা মনে করি যে, তার মধ্যকার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু আসলে তা নয়। এখানে শক্তির রূপান্তর হলো মাত্র। বস্তুর মধ্যে যে শক্তি চলমান অবস্থায় ছিল তা সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বস্তুটির মধ্যেই থেকে গেল। সুতরাং শক্তির কোন বিনাশ নেই।

এ দু'টি নিয়মের সাহায্য নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, কারণ যখন কার্যে পরিণত হয় তখন কারণের মধ্যে যে বস্তু ও শক্তি থাকে তা একই পরিমাণে কার্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং পরিমাণের দিক থেকে কারণ হলো কার্যের সমান।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

টীকা-১। চলমান ও সুপ্ত শক্তি (Kinetic and Potential Energy):

বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুতেই শক্তি আছে। এ শক্তি দু'প্রকারের হতে পারে, যথা-চলমান শক্তি ও সুপ্ত শক্তি। যে শক্তি কোন বস্তুতে ক্রিয়াশীল থাকে, যে শক্তি থাকবার জন্য কোন একটি বস্তু গতিবেগ প্রাপ্ত হয় এবং এক স্বান থেকে অন্য স্বানে চলাচল করে তাকে চলমান শক্তি বলে। আর যে শক্তি কোন বস্তুতে স্থির বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তাকে সুপ্ত শক্তি বলে। চলমান শক্তি হচ্ছে বস্তুর প্রকাশমান শক্তি। আর সুপ্ত শক্তি হচ্ছে অন্তর্নিহিত শক্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে গতিশীল বস্তুর শক্তি হচ্ছে চলমান শক্তি। আর স্থির বস্তুর শক্তি হচ্ছে সুপ্ত শক্তি।

*এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চলমান শক্তি ও সুপ্ত শক্তি পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরযোগ্য। এদের এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। একটি স্থির লোহার বলকে ধাক্কা দিলে সেটি চলতে থাকে। এক্ষেত্রে বস্তুটির মধ্যকার সুপ্ত শক্তি চলমান শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার একটি গতিশীল মাটির ঢিল আকাশ ভ্রমণ করে। যখন জমিনে পড়ে স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তার মধ্যকার চলমান শক্তি সুপ্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

টীকা-২। শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম ও কার্য-কারণ নিয়ম (Law of Conservation of Energy and Law of Causation) :

শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম অনুসারে এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু শক্তির পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। শক্তির কোন ক্ষয় নেই, কোন বৃদ্ধিও নেই। তাই বিশ্বজগতের সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ সব সময় একই থাকে।.

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কারণ ও কার্য শক্তির রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ-রূপ শক্তি রূপান্তরিত হয়ে কার্য-রূপ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়মের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারণের মধ্যে যে শক্তি থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে একই পরিমাণে কার্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ শান্তর দিক দিয়ে কারণ ও কার্য সমপরিমাণ। কার্য আসলে একটি রূপান্তরিত কারণ। কারণের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্হিত হয়, সেটিই কার্যের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড কারণ ও কার্যের সমতা প্রমাণ করতে গিয়ে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে কার্য যদি কারণের সমান না হয়, তাহলে কার্য সব সময়ই কারণ থেকে পরিমাণে বেশি হবে, না হয় সব সময়ই কম হবে, না হয় কখনও বেশি হবে আবার কখনও কম হবে। কিন্তু শেষের সম্ভাবনাটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা -নীতির পরিপন্থী। কেননা প্রকৃতি এক এক সময় এক এক ভাবে কাজ করতে পারে না। কাজেই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর কার্য যদি সব সময় কারণ থেকে পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে বিশ্বে বস্তু ও শক্তির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি তে থাকবে। আবার কার্য যদি সব সময় কারণ থেকে পরিমাণে কম হয়, তাহলে বিশ্বে বস্তু ও শক্তির পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকবে। কিন্তু শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম অনুসারে বিশ্ব জগতের সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকে। তাই প্রথম দু'টি সম্ভাবনাও বাতিলযোগ্য। সুতরাং কারণ ও কার্য পরিমাণের দিক দিয়ে সমান।

কারণের বৈশিষ্ট্য

আবশিক শর্ত হিসেবে কারণ

কোন কার্যকে ঘটানোর জন্য যেসব পূর্ববর্তী ঘটনার প্রয়োজন তাদের সমষ্টিকে বলা হয় কারণ। এ সমষ্টির প্রতিটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কার্যকে উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। এ ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে এক একটি শর্ত বলে। সুতরাং কারণ হল কতকগুলো শর্তের সমষ্টি। আর শর্ত হল কারণের এমন এক অপরিহার্য অংশ যা কার্য সৃষ্টি করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ শর্ত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তাই সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে-কোন্ প্রকারের শর্ত বা শর্ত সমষ্টিকে কারণ হিসেবে গণ্য করা যাবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে শর্তগুলোর প্রকৃতি ভাল করে জানা দরকার। যুক্তিবিদেরা কারণের শর্তকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা- (ক) আবশ্যিক শর্ত, (খ) পর্যাপ্ত শর্ত এবং (গ) পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কারণকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে, কেউ পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে এবং কেউ পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এখন আমরা কারণের আবশ্যিক শর্ত নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

যদি কোন শর্তের অনুপস্থিতিতে কোন ঘটনা ঘটা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ বিশেষ শর্তটিকে ঐ ঘটনার আবশ্যিক বা অনিবার্য শর্ত বলা হয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

আবশিক শর্ত হিসেবে কারণ

এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে-কোন ঘটনার আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে ঐ বিষয়টি যার অনুপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটতে পারে না; অর্থাৎ যখন ঘটনাটি ঘটে তখন আবশ্যিক শর্তটি অবশ্যই উপস্থিত থাকে। কথাটিকে আরও সুস্পষ্ট করে বলা যায়-যে শর্ত অনুপস্থিত থাকলে কার্য অনিবার্যভাবে অনুপস্থিত থাকে সে শর্তকে আবশ্যিক শর্ত বলে। আবশ্যিক শর্তের ধারণাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়। ক শর্তটি খ ঘটনার আবশ্যিক শর্ত হবে যদি-

(1) ক না ঘটলে খ ঘটে না। এবং (ii) ক ঘটলে খ নাও ঘটতে পারে।

উদাহরণ: মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হয় না। মেঘ অনুপস্থিত থাকলে বৃষ্টিও অনুপস্থিত থাকে। আবার, বৃষ্টি উপস্থিত হলে তার পূর্বে অবশ্যই মেঘ উপস্থিত থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মেঘ উপস্থিত হলেও বৃষ্টি নাও হতে পারে। সুতরাং মেঘ হচ্ছে বৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত।

কারণের বৈশিষ্ট্য

আবশিক শর্ত হিসেবে কারণ

এখানে মনে রাখা দরকার যে, একটি ঘটনার একাধিক আবশ্যিক শর্ত থাকতে পারে। এদের যে কোন একটা অনুপস্থিত থাকলে ঘটনাটি ঘটবে না। যেমন-অগ্নি সংযোগ ধূয়া সৃষ্টির একটি আবশ্যিক শর্ত। আবার ভিজা জ্বালানিও ধূয়া সৃষ্টির আর একটি আবশ্যিক শর্ত। এদের যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে ধুয়া সৃষ্টি হতে পারে না।

আমরা জানি যে, কারণ হচ্ছে কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ অবশ্যই কার্যের আগে থাকবে। যদি না থাকে, তবে কার্য ঘটবে না। আবশ্যিক শর্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি-

এক্ষেত্রে কার্য থেকে কারণ অনুমান করা যায়। অর্থাৎ কার্য ঘটেছে জানতে পারলে আমরা বলতে পারি যে, কারণও ঘটেছে। যেমন-বৃষ্টি হতে দেখছি; সুতরাং আকাশে মেঘ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হলেও কার্য নাও ঘটতে পারে। যেমন-আকাশে মেঘ দেখা দিলেও বৃষ্টি হওয়ার কথা অনুমান করা যায় না। কেননা, সব মেঘই বৃষ্টি বর্ষণ করে না। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা শুধু কারণের অভাব থেকে কার্যের অভাব অনুমান করতে পারি।

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ

কারণ কোন একক ঘটনা নয়। সাধারণত কারণ হল কতকগুলো শর্তের সমষ্টি। আর একটি শর্ত হল কারণের এমন এক অপরিহার্য অংশ যা কার্য সৃষ্টি করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ শর্ত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যুক্তিবিদেরা কারণের শর্তকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (ক) আবশ্যিক শর্ত, (খ) পর্যাপ্ত শর্ত এবং (গ) পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কারণকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে, কেউ পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে এবং কেউ পর্যান্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এখন আমরা পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণের প্রকৃতি আলোচনা করবো।

একটি ঘটনার পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে সে শর্ত যার উপস্থিতিতে উক্ত ঘটনাটি অবশ্যই ঘটবে।

এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে-যে শর্তের উপস্থিতিতে কোন ঘটনা অবশ্যই ঘটে, সে শর্তকে ঐ ঘটনার পর্যাপ্ত শর্ত বলে। অন্যভাবে বলা যায়-যদি দু'টি ঘটনার সম্বন্ধ এমন হয় যে, একটি ঘটলেই অপরটি ঘটে তাহলে প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনার পর্যাপ্ত শর্ত। পর্যাপ্ত শর্তের ধারণাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়:

ক শর্তটি খ ঘটনার পর্যাপ্ত শর্ত হবে যদি-

(i) ক ঘটলে খ ঘটে। কিন্তু

(ii) ক না ঘটলেও খ ঘটতে পারে।

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ

উদাহরণ: বিষপান মৃত্যুর একটি পর্যাপ্ত শর্ত। কেননা, বিষপান করলে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বিষপানই মৃত্যুর একমাত্র কারণ নয়। বিষপান ছাড়াও অন্য উপায়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। কাজেই বিষপান মৃত্যুর পর্যাপ্ত শর্ত, কিন্তু আবশ্যিক শর্ত নয়।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, একটি ঘটনার একাধিক পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে। বিষপান যেমন মৃত্যুর একটি পর্যাপ্ত শর্ত, তদ্রূপ বাস দুর্ঘটনা মৃত্যুর একটি পর্যাপ্ত শর্ত; আবার গুলিবিদ্ধ হওয়া মৃত্যুর অন্য একটি পর্যাপ্ত শর্ত। সুতরাং কারণ কথাটিকে পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে ব্যবহার করলে বুঝা যায় যে, কারণ হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যার অব্যবহিত পরে কার্য ঘটে। যেমন-বিষপানের পর পরই মৃত্যু ঘটে। তাই এক্ষেত্রে কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যায়। কিন্তু কার্য থেকে কারণ অনুমান করা যায় না। কেননা, বিষপান ছাড়াও নানাবিধ কারণে মৃত্যু ঘটতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা কার্যের অভাব থেকে কারণের অভাব অনুমান করতে পারি। কিন্তু কারণের অভাব থেকে কার্যের অভাব অনুমান করতে পারি না।

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ

যুক্তিবিদ মিল কারণকে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি অবশ্য একটু ভিন্নভাবে পর্যাপ্ত শর্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কোন ঘটনার পর্যাপ্ত শর্ত হল সে সব শর্তের সমাহার যাদের সমবেত উপস্থিতিতে উক্ত ঘটনাটি অবশ্যই ঘটবে।"১ তার মতে আবশ্যিক শর্ত অনেক হতে পারে। কিন্তু সব আবশ্যিক শর্তই পর্যাপ্ত শর্তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-দহন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপস্থিত শর্তগুলো হচ্ছে-আগুন লাগা, অক্সিজেনের উপস্থিতি, বস্তুর দাহ্যতা ইত্যাদি। এ শর্তগুলো উপস্থিত থাকলে দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তাই এ শর্তগুলোকে একত্রে পর্যাপ্ত শর্ত বলে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, মিল্লে মতে কোন ঘটনা ঘটার জন্য উপস্থিত প্রত্যেকটা শর্ত আলাদাভাবে আবশ্যিক শর্ত। আর আবশ্যিক শর্তসমূহের সমষ্টিই হল পর্যাপ্ত শর্ত। এককভাবে কোন শর্তই পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ

কারণের প্রকৃতি এবং শর্তের সাথে কারণের সম্পর্ক নির্ণয় করবার জন্য যুক্তিবিদেরা কারণের শর্তকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (ক) আবশ্যিক শর্ত, (খ) পর্যাপ্ত শর্ত এবং (গ) পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কারণকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের মতে কোন কার্যের কারণ হল এমন একটি ঘটনা যা সব সময়ই কার্যের আগে ঘটে। অর্থাৎ কারণ হল কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। এ মতে কারণ আবশ্যিক শর্ত বলে কার্য থেকে কারণ অনুমান করা যায়। কিন্তু কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যায় না।

আবার কেউ কেউ কারণকে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে কারণ হল এমন একটি ঘটনা যার ঠিক পরে কার্যটা ঘটে। অর্থাৎ কার্য হল কারণের অপরিবর্তনীয় পরবর্তী ঘটনা। এ মতে কারণ পর্যাপ্ত শর্ত বলে কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যায়। কিন্তু কার্য থেকে কারণ অনুমান করা যায় না।

এভাবে কারণকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ ও শর্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দেয়। কারণকে কারণ বলে এবং কার্যকে কার্য বলে চিনে নিতে হয়রানি হতে হয়। এসব অসুবিধা দূর করবার জন্য কোন কোন যুক্তিবিদ কারণকে পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। এখন দেখা যাক পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত কি?

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ

যদি দু'টি ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ এমন হয় যে, প্রথমটি না ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে না এবং প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে, তাহলে প্রথম ঘটনাটিকে দ্বিতীয় ঘটনার পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বলা হয়।

যারা কারণকে পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করেন তাদের মতে কারণ হল এমন ঘটনা যার অব্যবহিত পরে কার্য সংঘটিত হয় এবং যা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে অবস্থান করে। তারা বলেন, যদি পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত দ্বারা কারণ গঠিত হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, কারণ হচ্ছে কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা এবং কার্য হচ্ছে কারণের অপরিবর্তনীয় অনুবর্তী ঘটনা।

পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্তের ধারণাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়:

ক শর্তটি খ ঘটনার পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হবে যদি-

(i) ক না ঘটলে খ ঘটে না।

এবং (ii) ক ঘটলে খ ঘটে।

উদাহরণ: ভিজা কাঠে আগুন জ্বালালে ধূয়ার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, ভিজা কাঠে আগুন না জ্বালালে ধূয়া হয় না এবং ভিজা কাঠে আগুন জ্বালালেই ধূয়া হয়। এর থেকে বলা যায় যে, ভিজা কাঠে আগুন জ্বালানো ধূয়া সৃষ্টির পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত।

কারণের বৈশিষ্ট্য

পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, কারণকে পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারি কোন্ ঘটনা ঘটলে কার্য সংঘটিত হবে এবং কোন্ ঘটনা না ঘটলে কার্য সংঘটিত হবে না। এ দিকের বিচারে একই কার্যের একাধিক পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত থাকতে পারে না। কারণ কথাটিকে পর্যাপ্ত আবশ্যিক অর্থে ধারণা করলে বলতে হয়-কারণ হল এমন একটি ঘটনা যার অব্যবহিত পরে কার্যটি ঘটে এবং যা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা কারণ থেকে কার্য অনুমান করতে পারি, আবার কার্য থেকেও কারণ অনুমান করতে পারি। যেমন-ভিজা কাঠে আগুন জ্বালানো থেকে ধূয়া সৃষ্টির ঘটনা অনুমান করতে পারি। আবার ধূয়া সৃষ্টির ঘটনা থেকে ভিজা কাঠে আগুন জ্বালানোর ঘটনা অনুমান করতে পারি। সুতরাং কারণ বলতে আমরা যদি পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বুঝি, তাহলে আমরা

১। কার্য থেকে কারণ অনুমান করতে পারি।

২। কারণ থেকে কার্য অনুমান করতে পরি।

৩। কারণের অভাব থেকে কার্যের অভাব অনুমান করতে পারি। এবং

৪। কার্যের অভাব থেকে কারণের অভাব অনুমান করতে পারি।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

(ক) কার্য-কারণ সম্বন্ধে এ্যারিস্টটলের মতবাদ

যুক্তিবিদ্যার জনক এ্যারিস্টটল কারণকে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে কারণ একটি সরল ঘটনা নয়। এটি একটি জটিল ঘটনা। কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, একটি কার্যের উৎপত্তির ব্যাপারে আমরা চতুর্বিধ কারণ লক্ষ্য করতে পারি। তিনি এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। যথা-উপাদানগত কারণ (Material Cause), আকারগত কারণ (Formal Cause), নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause) ও উদ্দেশ্য কারণ (Final Cause)।

এ্যারিস্টটল একটি উদাহরণের সাহায্যে কারণের, মধ্যস্থিত চারটি ভিন্ন পর্যায়কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন শিল্পী পাথর দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করলেন। এ মূর্তিটি তৈরির ব্যাপারে চার প্রকার ভিন্ন কারণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়-

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

১। উপাদানগত কারণ: যে উপাদান দিয়ে কোন একটি বস্তু তৈরি করা হয় তাকে ঐ বস্তুর উপাদনগত কারণ বলে। যখনই বস্তুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোন কার্য উৎপাদিত হয় তখনই আমরা লক্ষ্য করি যে, বস্তুর উপাদানের উপর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কার্যের প্রকৃতি বহুলাংশে উপাদানের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই উপাদানকেও কারণের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। উপরের দৃষ্টান্তে শিল্পী যে উপাদান দিয়ে মূর্তি তৈরি করলেন তাকেই বলা হয় উপাদানগত কারণ। এক্ষেত্রে পাথর হচ্ছে উপাদানগত কারণ।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

২। আকারগত কারণ: যে আকার অনুসারে কোন একটি দ্রব্য তৈরি হয় তাকে ঐ দ্রব্যের আকারগত কারণ বলে। কোন একটি দ্রব্য তৈরি করতে গেলে বা কোন. একটি কার্য উৎপাদন করতে গেলে একদিকে যেমন কোন না কোন উপাদান প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি উপাদানের উপর কোন না কোন আকার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। উপাদানের উপর আকার প্রয়োগের মাধ্যমেই বস্তুর পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই আকারকেও কারণের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে একজন শিল্পী যখন একটি মূর্তি তৈরি করেন তখন তিনি তাঁর মনের যে আকার অনুসারে মূর্তিটি গড়েন তাকে বলা হয় আকারগত কারণ।

৩। নিমিত্ত কারণ: কোন কার্য উৎপাদনের জন্য যে শক্তি, কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োজন তাকে বলা হয় নিমিত্ত কারণ। শক্তির প্রভাবেই বস্তুর আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। কার্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই শক্তিকেও কারণের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। পূর্বের দৃষ্টান্তে পাথরের মূর্তি তৈরি করবার জন্য শিল্পী যে দৈহিক শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করেন এবং যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন তাকে নিমিত্ত কারণ বলে।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

৪। উদ্দেশ্য কারণ: যে উদ্দেশ্যে কোন একটি কর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে উদ্দেশ্য কারণ বলে। প্রতিটি কাজ বা প্রতিটি পরিবর্তনের পিছনেই কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে কোন কাজই চলতে পারে না। কাজেই উদ্দেশ্যকেও কারণের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যে উদ্দেশ্য বা সংকল্প নিয়ে শিল্পী পাথরের মূর্তিটি তৈরি করেন তাকে বলে উদ্দেশ্য কারণ। হয়ত বা কোন জাতীয় বীরের স্মৃতিকে অবিস্মরণীয় করে রাখবার জন্যই তিনি এ কাজটি করেছেন।

এ্যারিস্টটলের মতে উপাদানগত ও আকারগত কারণ দু'টি হচ্ছে বস্তুর আভ্যন্তরীণ কারণ। কেননা এগুলো বস্তুর অভ্যন্তরেই বিরাজ করে। উপাদান ও আকার বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্য। অপরদিকে নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য কারণ হচ্ছে বস্তুর বাহ্যিক কারণ। কেননা এগুলো বস্তুর বাইরে ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করে।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

(খ) কার্য-কারণ সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ (Popular views of Causation) :

সাধারণ লোকের মতে কারণ হচ্ছে কার্যের একটি পূর্বগামী ঘটনা, কোন একটি ঘটনা ঘটলে তারা তার পূর্বেকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেই কারণ বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, কারণের মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে যার প্রভাবে কার্যরূপ ঘটনাটি ঘটে যায়। যেমন-একটি লোক বিষপান করবার কিছুক্ষণ পর মারা গেল। এখানে বিষপান একটি পূর্ববর্তী ঘটনা। তাছাড়া, বিষের মধ্যে মৃত্যুকে উৎপন্ন করবার মত শক্তিও আছে। সুতরাং বিষপান হচ্ছে মৃত্যুর কারণ। সাধারণ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা কারণ ও কার্যের মধ্যকার প্রকৃতি সম্পর্ক সম্মন্ধে অজ্ঞ। তাই তাদের সকলের পক্ষে ঘটনাবলীর মধ্যে পূর্বাপর সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তদুপরি প্রকৃতিতে কোন্ শক্তির প্রভাবে কোন্ ঘটনার উদ্ভব ঘটছে তাও ঠিক করে বলা তাদের

পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক সময় তারা তাদের অজ্ঞতার দরুন প্রকৃত কারণের সন্ধান না পেয়ে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কোন ঘটনার কারণ বলে বিশ্বাস করে। যেমন-চন্দ্র গ্রহণের কারণ হিসেবে তারা মনে করে যে, রাহু নামক এক বিরাটকায় দৈত্য সাময়িকভাবে চাঁদকে গ্রাস করে ফেলে। তাই চাঁদে গ্রহণ লাগে। আবার, কোন এলাকায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সাধারণ লোক মনে করে যে, সে এলাকায় ওলাবিবির আবির্ভাব ঘটেছে।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

আমরা জানি যে, কারণ হচ্ছে সদর্থক ও নঞর্থক ও শর্তসমূহের সমষ্টি। কিন্তু সাধারণ লোক কোন কার্য উৎপন্ন হলে তার পূর্ববর্তী যে কোন একটি আকর্ষণীয় শর্তকে কারণ বলে মনে করে। শর্তটি তাদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করে যে, তারা তাকেই সমগ্র কারণ বলে ভুল করে। যুক্তিবিদ বেন বলেন, "লৌকিক দৃষ্টিতে কোন একটি ঘটনার কারণ হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যাকে সে মুহূর্তে প্রকৃত কার্য উৎপাদক ঘটনা হিসেবে শর্ত সমূহের সমাবেশ থেকে বাছাই করা হয়।" যেমন- একটি ছেলে গাছে ওঠবার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যায়। এখানে সাধারণ লোক পা পিছলে যাওয়াকেই হয়ত ছেলেটির ভূ-পতনের কারণ হিসেবে মনে করবে। কিন্তু আসলে ধারণাটি ঠিক নয়। ছেলেটির ভূ-পতনের পিছনে অনেকগুলো শর্ত কাজ করেছে। যেমন-দেহের ওজন, মাটির আকর্ষণ, বৃক্ষের উচ্চতা, পা পিছলে যাওয়া; অসাবধানতা, গাছের পিচ্ছিল অবস্থা ইত্যাদি। এদের মধ্যে পা পিছলে যাওয়া একটিমাত্র শর্ত। সুতরাং একে সমগ্র কারণ বলে ধারণা করা যায় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কারণ হচ্ছে সদর্থক ও নঞর্থক সবগুলো শর্তের সমাহার। তাই আমরা দেখতে পাই যে, কার্য কারণ সম্মন্ধে লৌকিক মতবাদ নানাবিধ ত্রুটি ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

(গ) কার্য-কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদ (Scientific view on Causation) :

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন ঘটনার কারণ হচ্ছে একটি অপরিবর্তনীয়, শর্তহীন, পূর্ববর্তী ঘটনা। কালের বিবেচনায় কারণ সব সময়ই কার্যের একটি পূর্ববর্তী ঘটনা।

কিন্তু যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাই কোন কার্যের কারণ নয়। কারণ হতে হলে তাকে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় ঘটনা হতে হবে। অর্থাৎ তাকে সর্বদাই কার্যের পূর্বে ঘটতে হবে। শুধু তাই নয়, কারণ হতে গেলে তাকে শর্তহীনও হতে হবে। অর্থাৎ ভিন্ন কোন শর্তের প্রভাব মুক্ত হয়ে সব সময় কার্যের পূর্বগামী হতে হবে।

বিজ্ঞানের মতে কারণ একটি একক ঘটনা নয়। কারণ হচ্ছে সদর্থক ও নঞর্থক শর্তসমূহের একটি সমষ্টি। কোন একটি কার্য উৎপাদনের জন্য যতগুলো শর্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাদের সবগুলোর সমষ্টিকেই কারণ বলে। যুক্তিবিদ বেন বলেন, "বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত বা অবস্থা কার্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজন তাদের সম্পূর্ণ সমষ্টিকেই কারণ বলে গণ্য করা হয়।"

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

কোন ঘটনার কারণ আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সময় কার্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র আছে এরূপ অবস্থাসমূহের সবগুলোকেই উল্লেখ করা হয় এবং এগুলোর সমষ্টিকেই কারণ বলে গণ্য করা হয়। যেমন-নদীতে নৌকা ডুবে একটি ছেলে মারা গেল। এখানে ছেলেটির মৃত্যুর ব্যাপারে অনেকগুলো শর্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে-নদীর প্রখর স্রোত, দমকা বাতাস, অত্যধিক যাত্রী বোঝাই ইত্যাদি শর্তের উপস্থিতি এবং মাঝির দক্ষতা, ছেলেটির সাঁতার জ্ঞান, উদ্ধারকারী নৌকা ইত্যাদি শর্তের অনুপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে ছেলেটির মৃত্যুর কারণ হচ্ছে এ সব সদর্থক ও নঞর্থক শর্তসমূহের সমষ্টি। এদের যে কোন একটি শর্ত মৃত্যুর কারণ নয়।

কারণের বৈশিষ্ট্য

কার্য-কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

(ঘ) শক্তির অবিনশ্বরতা অনুসারে কার্য-কারণ মতবাদ :

শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম অনুসারে এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শক্তির রূপের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু শক্তির পরিমাণের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তা বিশ্ব জগতের সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকে। বাস্তবে শক্তির কোন ধ্বংস নেই। এর কোন হ্রাস ও বৃদ্ধিও নেই। এ নিয়ম অনুসারে কারণ ও কার্য হচ্ছে শক্তির দু'টি ভিন্ন অবস্থা। কারণ ও কার্য শক্তির রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণরূপ শক্তি পরিবর্তিত হয়ে কার্যরূপ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ মতে, কারণের মধ্যে যে শক্তি থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে আবার একই পরিমাণে ভিন্ন শক্তিরূপে বা কার্যরূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং পরিমাণের দিক দিয়ে কারণ ও কার্য সমান।

শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম অনুসারে কারণ ও কার্য উভয়ই শক্তি বিশেষ। কারণ হচ্ছে শক্তির পূর্ব অবস্থা এবং কার্য হচ্ছে পরবর্তী অবস্থা। সুতরাং কার্য হচ্ছে এমন একটি কারণ যা রূপান্তরিত হয়েছে এবং কারণ হচ্ছে এমন একটি কার্য যা রূপান্তরিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎকে আমরা আলোর কারণ মনে করি। আসলে বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তরিত হয়ে আলো শক্তিতে পরিণত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৭ বহুকারণবাদ

টপিক ০৭: বহুকারণবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বহুকারণবাদ

বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। একটি কার্যের যে সব সময় একই কারণ থাকবে এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন কারণ একইরূপ কার্যকে উৎপন্ন করতে পারে। যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড বলেন, "একই কার্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হতে পারে; বস্তুত একই কার্যের বিভিন্ন বিকল্প কারণ থাকতে পারে।"

যুক্তিবিদ মিল সর্বপ্রথম কারণের বহুত্ব কথাটির প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, "একটি কার্য যে অবশ্যই একটি মাত্র কারণ বা শর্তের সমষ্টির সাথে জড়িত থাকবে, প্রতিটি ঘটনাই যে একইভাবে উৎপন্ন হবে একথা সত্য নয়। বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একই ঘটনার উৎপত্তি ঘটতে পারে।" যুক্তিবিদ বেন বলেন,

"কার্য কারণ তত্ত্ব অনুসারে একই কারণ সব সময়ই একই কার্য উৎপন্ন করে, কিন্তু এর বিপরীত কথা ঠিক নয়, একই কার্য সকল সময় একই কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কারণের মধ্যে বহুত্ব থাকতে পারে।"

উদাহরণস্বরূপ, একই কার্য 'মৃত্যু' বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ যথা-দুর্ঘটনা, কলেরা, ম্যালেরিয়া, সর্পদংশন, বিষপান, অনাহার ইত্যাদি থেকে ঘটতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর একাধিক বা বহু কারণ থাকতে পারে। অনুরূপভাবে, একই কার্য 'আলোক' বিভিন্ন সময় সূর্যকিরণ, বিজলী বাতি, হারিকেন, মোমবাতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থেকে আসতে পারে।

বহুকারণবাদ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু কারণবাদে কারণকে সব সময় একটা একক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি কারণ যে কতকগুলো শর্তের সমষ্টি সে বিষয়টি এতে বিবেচনা করা হয় না। কাজেই বহু কারণবাদ দ্বারা কারণের অন্তর্গত শর্তের বহুত্বের কথা বোঝানো হয় না। আবার বহু কারণবাদকে বহুকারণ সমন্বয়বাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। বহুকারণ সমন্বয় অনুসারে একাধিক কারণ একসাথে মিলিত হয়ে একটি মিশ্র কার্য উৎপন্ন করে। আর বহুকারণবাদ অনুসারে একাধিক কারণ স্বতন্ত্রভাবে একই কার্য উৎপন্ন করে।

সমালোচনা:

সাধারণ লোকের কাছে বহুকারণবাদ গ্রহণযোগ্য হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মতবাদটি অর্থহীন। কার্যের প্রকৃতি সম্মন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপরই এ মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে কারণ ও কার্যকে দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়। এতে আমরা কারণকে বিবেচনা করি বিশেষ অর্থে এবং কার্যকে বিবেচনা করি সাধারণ অর্থে। কিন্তু আমরা যদি কারণ ও কার্যকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি তাহলে আর কারণের বহুত্বের অবকাশ থাকে না। নিম্নের কয়েকটি উপায়ে এ মতবাদটির অসারতা প্রমাণ করা যায়।

বহুকারণবাদ

প্রথমত, বহুকারণবাদের অসারতা প্রমাণের একটি উপায় হচ্ছে কার্যের প্রকৃতি বিশেষভাবে উদঘাটন করা। কার্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বহুকারণবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কার্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কারণ থেকে প্রাপ্ত কার্যের প্রকৃতিও ভিন্ন। মৃত্যুর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণ থেকে সৃষ্ট মৃত্যু ভিন্ন প্রকৃতির। সর্প দংশনে মৃত্যু আর ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু আসলে একরূপ নয়। তারা ভিন্ন প্রকৃতির। তেমনি সূর্যের আলো আর মোমবাতির আলো এক জিনিস নয়।

সূর্যের আলো কেবল সূর্যই দিতে পারে, অন্য কিছু নয়। তদ্রুপ মোমবাতির আলো কেবল মোমবাতিই দিতে পারে, অন্য কিছু নয়। এভাবে কার্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক কার্যের মাত্র একটা কারণই থাকে, একাধিক নয়।

বহুকারণবাদ

দ্বিতীয়ত, বহুকারণবাদ খণ্ডনের আর একটি উপায় হচ্ছে কারণের সার্বিকীকরণ করা।
কারণকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে বহুকারণবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এ মতবাদের সমর্থকেরা কার্য ও কারণকে একই অর্থে বিচার করেন না। যদি কার্যকে সাধারণ অর্থে বিচার করা হয়, তাহলে কারণকেও সাধারণ অর্থে বিচার করা উচিত। বহুকারণবাদীরা যেমন সাধারণভাবে মৃত্যুর কথা বলেন, তাদের তেমন সাধারণভাবে তার কারণের কথাও বলা উচিত। মৃত্যুর বিভিন্ন কারণকে সাধারণভাবে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, সবগুলো কারণের মধ্যে একটি সাধারণ অবস্থা বর্তমান। সেটি হলো হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। সুতরাং, এ সাধারণ অবস্থাকেই সাধারণ মৃত্যুর কারণ বলা উচিত। তাহলে আর কারণের বহুত্বের অবকাশ থাকে না।

বহুকারণবাদ

তৃতীয়ত, এ মতবাদটি কারণের সংজ্ঞার সাথে বিরোধপূর্ণ।
কারণের সংজ্ঞা অনুসারে কারণ হলো একটি অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন হয়। এভাবে একই কার্য যদি ভিন্ন ভিন্ন কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহলে কারণকে আর অপরিবর্তনীয় ঘটনা বলা যায় না। 'মৃত্যু' যদি এক সময় বিষপান, অন্য সময় দুর্ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহলে মৃত্যুর কারণ অপরিবর্তনীয় নয়। এটি একটি পরিবর্তনীয় ঘটনা।
এ সব কারণে বলা চলে যে, বহুকারণবাদ একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। সুতরাং একই কার্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ থেকে আসতে পারে না। একটি কার্যের মাত্র একটিই কারণ থাকবে। যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড বলেন, "আমরা যদি ঘটনাবলীকে সূক্ষ্মভাবে জানতাম, তাহলে দেখা যেত যে, প্রতিটি কার্যের জন্য মাত্র একটিই কারণ আছে। কেননা, ঘটনা প্রবাহের গতি সামনের দিকে যেমন পিছনের দিকেও তেমন নিয়মানুবর্তী।" যুক্তিবিদ বেন বলেন, "বহুকারণবাদ বস্তু প্রকৃতি ঘটিত বাস্তব সত্য সম্পর্কে যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের একটি নিদর্শন।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৮ কার্য-সংমিশ্রণ

টপিক ০৮: কার্য-সংমিশ্রণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কার্য-সংমিশ্রণ

যখন একাধিক কারণ পৃথক পৃথক কার্য উৎপন্ন না করে একসাথে মিলিতভাবে একটি মিশ্রিত কার্যকে উৎপন্ন করে তখন বিভিন্ন কার্যের এ মিশ্রণকে কার্য-সংমিশ্রণ বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থেকে সৃষ্ট কার্যগুলো স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে না। তারা এমনভাবে মিশ্রিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে যে, কারণ অনুসারে তাদের আর পৃথক করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘরে একসাথে দশটি মোমবাতি জ্বালালে ঘরে দশটি মোমবাতির সম্মিলিত আলো দেখা যাবে। এখানে ঘরের আলো প্রতিটি মোমবাতি থেকে পৃথকভাবে উৎপন্ন আলোর একটি মিশ্রিত ফল। সুতরাং মোমবাতিগুলো থেকে উৎপন্ন মিশ্রিত আলোকে কার্য সংমিশ্রণ বলা হয়।

কার্য-সংমিশ্রণ

কার্য সংমিশ্রণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে, যথা-সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ ও ভিন্নজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ।

১। সমজাতীয় কার্য-সংমিশ্রণ (Homogenious Intermixture of Effects) :

যদি একাধিক কারণ একসাথে কাজ করে এমন একটি মিশ্রিত কার্য উৎপন্ন করে যা প্রতিটি কারণ থেকে পৃথকভাবে সৃষ্ট কার্যের সমজাতীয় হয়, তাহলে এ কার্য সংমিশ্রণকে সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণগুলো তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ করে কার্য উৎপন্ন করে। কিন্তু কার্যগুলো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তারা একসাথে মিশে যায়। সুতরাং মিশ্রিত কার্যটি পৃথকভাবে সৃষ্ট কার্যগুলোর সমষ্টি মাত্র। যেমন-একটি ঘরের মধ্যে ৫০ ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি বৈদ্যুতিক বাতি একসাথে জ্বালিয়ে দিলে ঘরের মধ্যে যে মিশ্রিত আলোর সৃষ্টি হবে তা হলো ১৫০ ক্ষমতাসম্পন্ন। এখানে ঘরের আলো একটি কার্য সংমিশ্রণ। তবে এ কার্য সংমিশ্রণটি সমজাতীয়, কেননা এতে মিশ্রিত কার্যটি স্বতন্ত্র কার্যগুলোর অনুরূপ। আবার, একজন লোক ২০ সের ওজনের দু'টি ভিন্ন বোঝাকে একসাথে মাথায় বহন করলে বোঝা থেকে ৪০ সের ওজনের চাপ অনুভব করবে। এখানে বোঝা দু'টির স্বতন্ত্র চাপ এবং মিলিত চাপ সমজাতীয়। তাই এ কার্য সংমিশ্রণকে সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ বলে।

কার্য-সংমিশ্রণ

২। ভিন্নজাতীয় কার্য-সংমিশ্রণ (Heteropathic Intermixture of Effects) :

যদি একাধিক কারণ একসাথে কাজ করে একটি মিশ্রিত কার্য উৎপন্ন করে এবং কার্যটি যদি কারণগুলো থেকে ভিন্ন জাতীয় হয়, তাহলে এ কার্য সংমিশ্রণকে ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ বলে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশ্রিত কার্যটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। একে আর কারণ অনুসারে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় না। যেমন-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দু'টি ভিন্ন গ্যাসকে নির্দিষ্ট অনুপাতে একসাথে মিশিয়ে দিলে তাদের মিশ্রণ থেকে পানি উৎপন্ন হয়। এখানে পানি একটি মিশ্রিত কার্য। তবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে পানি ভিন্ন জাতীয়। পানির প্রকৃতি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রকৃতি থেকে ভিন্নরূপ। পানিতে এদের কোন গুণাগুণ বর্তমান থাকে না। তাই এখানে যে কার্য সংমিশ্রণ হয় তা ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ। আবার, একজন লোক ভাত, তরকারী, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাওয়ার পর সেগুলো হজম হয়ে রক্তে পরিণত হলো। এখানে রক্ত হচ্ছে একটি মিশ্রকার্য। তবে এখানে যে কার্য সংমিশ্রণ হচ্ছে তা একটি ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ। কেননা রক্তের প্রকৃতি ও গুণাগুণ মাছ, মাংস ইত্যাদি থেকে ভিন্নতর।

কার্য-সংমিশ্রণ

টীকা: প্রগতিশীল কার্য (Progressive Effects):

কারণকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা-অস্থায়ী কারণ ও স্থায়ী কারণ। যে কারণ কার্য উৎপাদনের পরপরই শেষ হয়ে যায়, তাকে অস্থায়ী কারণ বলে। কিন্তু যে কারণ কখনই নিঃশেষ হয় না, যে কারণ প্রতি মুহূর্তে কার্য উৎপাদন করে চলে তাকে স্থায়ী কারণ বলে। যেমন- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, সূর্যের তাপ ইত্যাদি। একটি স্থায়ী কারণের কাজকে একই জাতীয় কতকগুলো ভিন্ন কারণের ধারাবাহিক কাজ বলে মনে করা যেতে পারে। স্থায়ী কারণ যেমন নিঃশেষ হয় না, তার কার্যও তেমন নিঃশেষ হয় না। তার কার্য পুঞ্জীভূত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে। একটি স্থায়ী কারণের পুঞ্জীভূত কার্যকে বলে প্রগতিশীল কার্য।

একটি স্থায়ী কারণ প্রগতিশীল কার্য উৎপাদন করবার জন্য দু'ভাবে কাজ করতে পারে। প্রথমত, যদি স্থায়ী কারণটি অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে তা ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর কার্য উৎপাদন করতে থাকে। যেমন-একটি জড়বস্তু আকাশ থেকে মাটির দিকে পতিত হওয়ার সময় প্রতিমুহূর্তে তার উপর মাটির আকর্ষণ কাজ করতে থাকে এবং বস্তুটির পতনের গতি প্রতি মুহূর্তে বর্ধিত হারে বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থায়ী কারণটি যদি নিজেই পরিবর্তনীয় হয়, তাহলে তা থেকে উৎপন্ন কার্য দ্বিগুণমাত্রায় গতিশীল হয়ে ওঠে। যেমন-সূর্য যতই দিগন্ত রেখা থেকে লম্বরেখার দিকে ধাবিত হয়, ততই তার রশ্মির উত্তাপও বাড়তে থাকে। যুক্তিবিদ মিল প্রগতিশীল কার্যকে সমজাতীয় কার্যসংমিশ্রণের অন্তর্গত বলে মনে করেন।

কার্য-সংমিশ্রণ

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের মধ্যে পার্থক্য

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তিনটি ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন মতবাদগুলো বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করবোঃ

১। কোন কোন যুক্তিবিদ যেমন-মিল, বেন ও ভেন মনে করেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি একটি মৌলিক নিয়ম এবং কার্য-কারণ তার একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র। যুক্তিবিদ বেনের মতে নিয়মানুবর্তিতা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা: সহ-অবস্থানজনিত নিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Co-existence), অনুগমনজনিত নিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Succession), ও সমতা বা অসমতাজনিত নিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Equality or Inequality)। কার্য-কারণ নিয়ম দ্বিতীয় প্রকার নিয়মানুবর্তিতার একটি নামান্তর। কার্য-কারণ নিয়মে শুধু বলা হয় না যে, প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ আছে। এতে আরও বলা হয় যে, একই কারণ থেকে একই কার্যের উৎপত্তি হয়।

কার্য-সংমিশ্রণ

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের মধ্যে পার্থক্য

২। জোসেফ, মেলোন প্রমুখ যুক্তিবিদগণ মনে করেন যে, কার্য-কারণ নিয়মটিই মৌলিক এবং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি এর অন্তর্ভুক্ত। কার্য-কারণ নিয়ম দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি পূর্বাপর সম্পর্ক প্রকাশ করে। এ সম্পর্কটি অনিবার্য। প্রকৃতির সমুদয় ঘটনাই এ সম্পর্কে আবদ্ধ। এ নিয়ম অনুসারে কারণ ও কার্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ কার্য সব সময়ই কারণকে অনুসরণ করে। কারণের অব্যবহিত পরে কার্য ঘটে। কার্য-কারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ আছে এবং একই কারণ থেকে একই কার্যের উৎপত্তি হয়। কার্য ও কারণের এ সম্পর্ক থেকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে। লস আর নাই

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের মধ্যে পার্থক্য

৩। সিগওয়াট, বোসাঙ্কে, ওয়েলটন প্রমুখ যুক্তিবিদেরা মনে করেন যে, কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আসলে দু'টি স্বতন্ত্র নিয়ম। তবে এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাদের মতে কার্য-কারণ নিয়মে বলা হয় যে, প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ আছে। এর থেকে একটু বাড়িয়ে যদি বলা হয় যে, একই কারণ থেকে একই কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহলেই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার আওতায় গিয়ে পড়তে হয়। কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। আর প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে এ সম্পর্ককে বিশেষ থেকে সার্বিকে উন্নীত করা হয়।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক উপরের তিনটি মতবাদ আলোচনার পর বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি সব রকম আরোহেরই আকারগত ভিত্তি।

কার্য-সংমিশ্রণ

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের মধ্যে পার্থক্য

কারণ সব আরোহেই সার্বিকীকরণ আছে এবং সেজন্য তাদেরকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কার্য-কারণ নিয়মটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক আরোহের রূপগত ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক আরোহে সার্বিকীকরণের আগে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে হয়। সুতরাং কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি উভয়ই বৈজ্ঞানিক আরোহের রূপগত ভিত্তি। আর এ হিসেবে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক আরোহের আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে পদার্পণ করবার সময় আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করি। আবার সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে দু'টি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সময় আমরা কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ০৯ আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

টপিক ০৯: আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

আরোহের বস্তুগত ভিক্তি বলতে আমরা এমন কয়েকটি প্রক্রিয়াকে বুঝি যারা আরোহ অনুমানের আশ্রয় বাক্যগুলোকে সরবরাহ করে এবং সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

আরোহ অনুমানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুগত সত্যতা অর্জন করা। এর মূল লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে অনুমানের বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তবের মিল বা সঙ্গতি আছে কিনা। আরোহ অনুমানে আমরা কতিপয় বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। আশ্রয় বাক্যগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। এগুলোকে হয় নিরীক্ষণের মাধ্যমে, না হয় পরীক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। কাজেই এদের থেকে অনুমিত সিদ্ধান্ত বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আরোহ অনুমানে বস্তুগত সত্যতা অর্জনের জন্য একটি পৃথক ভিত্তি রয়েছে। এ ভিত্তির নাম বস্তুগত ভিত্তি। আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হচ্ছে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। কেননা, এরা উভয়েই আরোহের আশ্রয়বাক্যগুলোকে সরবরাহ করে এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা বিধান করে।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

একটি অনুমানের সিদ্ধান্ত তার আশ্রয়বাক্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই স্থাপন করা হয়। তাই সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতার উপর নির্ভর করে। আরোহের আশ্রয়বাক্যগুলো আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, এগুলোকে আমরা বাস্তব ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করে অথবা পরীক্ষণ করে সংগ্রহ করি। সুতরাং এ আশ্রয়বাক্যগুলো বস্তুগতভাবে সত্য। এরূপ কয়েকটি আশ্রয়বাক্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের দু'টি-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের সাহায্য নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত অনুমান করি বলে সিদ্ধান্তটিকেও বস্তুগতভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। কাজেই আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতার উপর এবং আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের উপর। তাই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ হচ্ছে আরোহের বস্তুগত ভিত্তি।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃতি প্রদত্ত কোন ঘটনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে নিরীক্ষণ বলে। নিরীক্ষণ একপ্রকার প্রত্যক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করি। রাস্তা দিয়ে চলার সময় আমরা রাস্তার দু'পাশের অনেক দৃশ্যই চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখি, অনেক শব্দই আমাদের কানে ভেসে আসে এবং অনেক গন্ধই আমাদের নাকে প্রবেশ করে। কিন্তু এসব এলোপাতাড়ি দেখা বা শোনা নিরীক্ষণ নয়। এগুলো অসতর্ক ও উদ্দেশ্যবিহীন প্রত্যক্ষণ। এদের প্রতি আমাদের তেমন মনোযোগ থাকে না। এ সবের মধ্যে খুব কম বস্তু বা ঘটনাই আমাদের মনের উপর একটা ছাপ রাখতে পারে। সুতরাং কোন বস্তু বা ঘটনা সম্মন্ধে পূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সাথে ধীর স্থিরভাবে কোন কিছু দেখা, শোনা ইত্যাদি হচ্ছে নিরীক্ষণ। বাংলা 'নিরীক্ষণ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে- Observation, শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ০৮ ও servare শব্দ দুটি থেকে। ob শব্দের অর্থ সামনে এবং servare শব্দের অর্থ রাখা। সুতরাং এর ভাষাগত অর্থ হচ্ছে Keeping something before the mind অর্থাৎ কোন কিছুকে মনের সামনে রাখা। তাই এদিক থেকে বিবেচনা করলে কোন কিছুকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যক্ষ করাকে নিরীক্ষণ বলে। যুক্তিবিদ্যার বিশিষ্ট গ্রন্থকার কালিদাস সেন নিরীক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "নিরীক্ষণ হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত পরিবেশের অধীনে বস্তুসমূহ ও ঘটনাবলীর এক প্রকার পদ্ধতিগত প্রত্যক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ, রাস্তার পার্শ্বে মানুষের একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে একজন সাংবাদিক ছুটে এলেন। মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি আগ্রহী হলেন। এ মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য তিনি মৃত্যুর সাথে যুক্ত অবস্থাদি মনোযোগ সহকারে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে মৃত্যুর ঘটনাটিকে নিয়ে সাংবাদিকের উদ্দেশ্যমূলক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণই হচ্ছে নিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলোর সন্ধান পাই:

১। নিরীক্ষণ হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের প্রত্যক্ষণ।

নিরীক্ষণ এক প্রকারের প্রত্যক্ষণ। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করি। আমরা চোখ দিয়ে বস্তুর বর্ণ দেখি, কান দিয়ে শব্দ শুনি, নাক দিয়ে গন্ধ পাই, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি এবং ত্বক দিয়ে তাপ অনুভব করি। কিন্তু এসব সাধারণ প্রত্যক্ষণকে সব সময় নিরীক্ষণ বলা যায় না। নিরীক্ষণ হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ যা কিছু শর্তের অধীন এবং যাতে কিছু বিশেষ লক্ষণ উপস্থিত।

২। নিরীক্ষণ হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ।

নিরীক্ষণ সব সময়ই উদ্দেশ্যমূলক। কিছু কিছু বস্তু বা ঘটনা স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে হাজির হয় এবং আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না করেই বিলীন হয়ে যায়। কেননা, এগুলো প্রত্যক্ষ করবার মত আমাদের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করলে তা আমাদের মনে রেখাপাত করে। যেমন-সাধারণ মানুষ যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখে তখন নেহায়েত কৌতূহল বশতই তা দেখে। তাদের তেমন কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্ঞান অর্জনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেন। কাজেই তাঁর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে নিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৩। নিরীক্ষণ হচ্ছে সুপরিকল্পিত প্রত্যক্ষণ।

নিরীক্ষণ সব সময়ই সুপরিকল্পিত প্রত্যক্ষণ। এলোমেলো বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা যায় না। এরূপ প্রত্যক্ষণ থেকে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনাবলী খুবই জটিল। এদের একটি অপরটির সাথে মিলেমিশে থাকে বা ঘটে। তাই কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পূর্ব থেকেই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। যেমন-সদ্য ঘটে যাওয়া একটি ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য একজন পর্যবেক্ষককে স্থির করতে হবে কোন্ অবস্থান থেকে কোন্ পথে কিভাবে তিনি অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার নিরীক্ষণকে হতে হবে সুপরিকল্পিত।

৪। নিরীক্ষণ হচ্ছে একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ।

নিরীক্ষণ সব সময়ই সুনিয়ন্ত্রিত। কোন অনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ নিরীক্ষণ বলে বিবেচিত নয়। যে প্রত্যক্ষণ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যা খুবই মনোযোগ সহকারে ধীর স্থিরভাবে সম্পন্ন হয় তাকেই আমরা বলি নিরীক্ষণ। সুতরাং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণই হচ্ছে নিরীক্ষণ। যেমন-কোন একটি অগ্নিদগ্ধ বাড়িতে জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন সমাজকর্মী ঘটনাস্থলের সবকিছু মনোযোগ সহকারে দেখাশুনা করলে তার প্রত্যক্ষণ হবে একটি নিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৫। নিরীক্ষণ সবক্ষেত্রেই নির্বাচনমূলক।

আমরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে বস্তু বা ঘটনাকে নিরীক্ষণ করি। তাই নিরীক্ষণের সময় আমরা প্রাসঙ্গিক বস্তু বা ঘটনা বেছে নেই এবং সেদিকেই আমাদের মনোযোগ অর্পণ করি। উদ্দেশ্যের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমরা নিরীক্ষণ থেকে বাদ দেই। যেমন- ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমরা শুধু ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের উপরই নিরীক্ষণ কার্য চালাই। ভিন্ন রোগে আক্রান্ত কোন রোগীর কাছে যাই না।

৬। নিরীক্ষণ হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত ঘটনার প্রত্যক্ষণ।

নিরীক্ষণের বেলায় আমরা প্রকৃতিতে যে সব ঘটনা ঘটে শুধু তাই-ই প্রত্যক্ষ করি। কোন একটি ঘটনা প্রকৃতিতে যেভাবে উপস্থিত হয় ঠিক সেভাবেই আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের সুবিধামত কোন ঘটনাকে ঘটিয়ে নিতে পারি না বা ঘটনা পরিবর্তন করতে পারি না। আমাদের প্রয়োজনীয় ঘটনা নিরীক্ষণের জন্য প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাটি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়। যেমন-আমরা যদি চন্দ্রগ্রহণকে নিরীক্ষণ করতে চাই, তাহলে প্রকৃতিতে ঘটনাটি ঘটার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের শর্ত

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বস্তু বা ঘটনাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষ করবার নামই নিরীক্ষণ। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষ করবার ব্যাপারটি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে। যুক্তিবিদ জয়েস যথার্থ নিরীক্ষণের জন্য তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

১। বুদ্ধিগত শর্ত;
২। দৈহিক শর্ত;
৩। নৈতিক শর্ত।

১। বুদ্ধিগত শর্ত (Intellectual Condition):

প্রতিটি যথার্থ নিরীক্ষণের বেলায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কোন। বস্তু বা ঘটনার স্বরূপ প্রকাশের প্রতি মনোযোগী হই এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে যুক্ত কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করি। নিরীক্ষণের এ দিকটি হচ্ছে জ্ঞানমূলক দিক। অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবার জন্যই আমরা সে বিষয়কে নিরীক্ষণ করি। কাজেই ফলপ্রসু নিরীক্ষণ নিরীক্ষকের মানসিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। নিরীক্ষণের জন্য প্রথমে উদ্দেশ্য নিরূপণ, উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সেখানে সুপরিকল্পিত প্রত্যক্ষণের জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিশক্তির প্রয়োজন। তাই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু নিরীক্ষণ করা যতটা সহজ, নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে ততটাই কঠিন। সুতরাং নিরীক্ষণের জন্য বুদ্ধিগত শর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের শর্ত

২। দৈহিক শর্ত (Physical Condition)

নিরীক্ষণের দৈহিক শর্ত বলতে আমরা বুঝি নিরীক্ষকের দৈহিক সুস্থতা। নিরীক্ষণ কালে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যবহার করে কোন বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। কাজেই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কার্যকারিতার উপর নিরীক্ষণের যথার্থতা নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি যদি চোখে কম দেখেন বা তিনি যদি বর্ণান্ধ হন, তাহলে তাঁর পক্ষে চোখ দিয়ে কোন কিছু যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। একইভাবে শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদি স্বাভাবিক পর্যায়ে না থাকলে নিরীক্ষণ সঠিক হয় না। সুতরাং নিরীক্ষণের জন্য দৈহিক শর্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের শর্ত

৩। নৈতিক শর্ত (Moral Condition)

নিরীক্ষণের নৈতিক শর্ত বলতে আমরা বুঝি নিরীক্ষণকারীর নৈতিক সক্ষমতা। নিরীক্ষণকারী নৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হবেন-এটাই সবার কাছে কাম্য। নৈতিকতার বিচারে যা কিছু ন্যায় তা গ্রহণ করবার এবং যা কিছু অন্যায় তা বর্জন করবার মত তাঁর মানসিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন কিছু নিরীক্ষণ কালে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। কোন কিছুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। এমন হতে পারে যে, কোন অপরাধমূলক ঘটনা নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনার সাথে যুক্ত কিছু লোক নিরীক্ষণকারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়, আবার কিছু লোক শত্রুস্থানীয়। এক্ষেত্রে যদি তিনি নিরপেক্ষ না থাকেন, অর্থাৎ আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতি অনুকম্পা দেখান এবং শত্রুদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেন, তাহলে তার নিরীক্ষণের কোন নৈতিক মূল্য থাকবে না। সুতরাং নৈতিক শর্ত নিরীক্ষণের জন্য নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের অনুপপত্তি

নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব ঘটনাবলী থেকে আরোহের আশ্রয়বাক্য সংগ্রহ করি। নিরীক্ষণ আরোহ অনুমানের একটি বস্তুগত ভিত্তি। কিন্তু তাই বলে নিরীক্ষণ সব সময় অভ্রান্ত নয়। নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই। এরূপ ভুল-ভ্রান্তিকে নিরীক্ষণের অনুপপত্তি বলে। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে দু'প্রকারের অনুপপত্তি ঘটতে পারে। তার একটি নঞর্থক জাতীয় অনুপপত্তি এবং অপরটি সদর্থক জাতীয় অনুপপত্তি। নঞর্থক অনুপপত্তির নাম (ক) অনিরীক্ষণ এবং সদর্থক অনুপপত্তির নাম (খ) ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।

নিরীক্ষণের অনুপপত্তি সম্পর্কিত একটি ছক এখানে দেওয়া হল ঃ

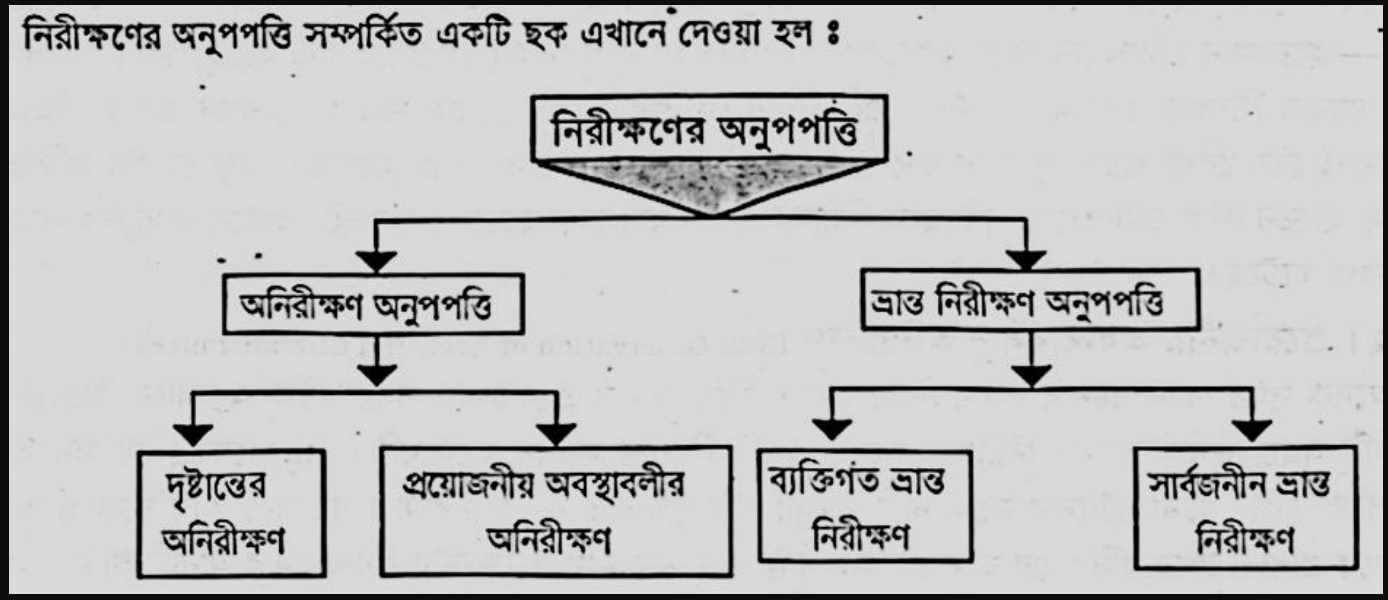

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের অনুপপত্তি

(ক) অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি (Fallacy of Non-Observation) :

অনিরীক্ষণ একটি ত্রুটিপূর্ণ নিরীক্ষণ। আরোহের কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে যে সব বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ করা দরকার সেগুলো যদি নিরীক্ষণ না করা হয়, তাহলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে বলা হয় অনিরীক্ষণ। আমরা যখন কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে চাই তখন তার সাথে সংযুক্ত সবগুলো বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যদি সবগুলো ক্ষেত্র নিরীক্ষণ না করে আমাদের সুবিধামত অল্প কিছু ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই তাহলে এ ধরনের অনুপপত্তি দেখা দেয়। অনিরীক্ষণ নঞর্থক জাতীয় অনুপপত্তি, কেননা এখানে আংশিকভাবে নিরীক্ষণের ফলে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিরীক্ষণ থেকে বাদ পড়ে যায়। আর অপ্রয়োজনীয় কিছু বিষয়বস্তু নিরীক্ষণকারীর কাছে প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। যেমন-কোন একজন লোক সিদ্ধান্ত করলেন যে, শেষ রাতের স্বপ্ন সব সময় সফল হয়। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তিনি বেশ কিছু দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করলেন। তিনি বেছে বেছে যেসব ক্ষেত্রে শেষ রাতে দেখা স্বপ্ন সফল হয়েছে সেগুলো নিরীক্ষণ করলেন এবং তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে শেষ রাতের স্বপ্ন সফল হয়নি সেগুলো তিনি নিরীক্ষণ করলেন না। এক্ষেত্রে লোকটির নিরীক্ষণ দোষযুক্ত। এখানে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি দেখা দিয়েছে।

অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি দু'প্রকারের হতে পারে; যথা: ১। দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ এবং ২। প্রয়োজনীয় অবস্থাবলীর অনিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের অনুপপত্তি

ক. ১। দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ (Non-Observation of Instances):

অনেক সময় অত্যধিক ব্যস্ততা বা অসাবধানতা বশত নিরীক্ষণ করবার সময় উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করেই আমরা সিদ্ধান্ত অনুমান করে বসি। এর ফলে যে অনুপপত্তি ঘটে তার নাম প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ। এরূপ অনুপপত্তির মূল কারণ হলো কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস। অনেক সময় আমরা আগে থেকেই কোন একটি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকি। তাই যে সমস্ত দৃষ্টান্ত আমাদের মতবাদের অনুকূল আমরা সেগুলোকে খুবই আগ্রহের সাথে নিরীক্ষণ করি। কিন্তু যেগুলো প্রতিকূল তাদের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করি না। যেমন-কয়েকজন প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখা নিরীক্ষণ করে দেখা গেল যে, তাদের হাতের লেখা খারাপ। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে, সকল প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখাই খারাপ। এখানে যেসব প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখা খারাপ শুধুমাত্র তাদের কয়েকটি দৃষ্টান্তই নিরীক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু যে সব প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখা ভাল তাদের দৃষ্টান্তকে নিরীক্ষণ থেকে বাদ রাখা হয়েছে। কাজেই, এখানে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ ঘটেছে।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

নীরিক্ষণের অনুপপত্তি

ক.২। প্রয়োজনীয় অবস্থাবলীর অনিরীক্ষণ (Non-Observation of Essential Circumstances): অনেক সময় কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করেই একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করে বসি। এরূপ ক্ষেত্রে যে সব অবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি ঘটনা ঘটানোর জন্যে দায়ী তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আমরা কয়েকটি আকস্মিক ও অবান্তর অবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে বসি। এর ফলে যে অনুপপত্তি ঘটে তার নাম প্রয়োজনীয় অবস্থাবলীর অনিরীক্ষণ। যেমন-কোন জেল হাজতে অধিক মাত্রায় চোর-ডাকাতের আগমন লক্ষ্য করে আমরা যদি বলি যে, এলাকায় চোর-ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে। আসলে ঘটনাটি ঘটেছে পুলিশের তৎপরতার জন্যে, চোর-ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে নয়। পুলিশ আগের তুলনায় বর্তমানে অধিকমাত্রায় তৎপর হওয়ার ফলেই বেশি সংখ্যায় চোর-ডাকাত ধরা পড়েছে। চোর-ডাকাতের সংখ্যা আগে যা ছিল বর্তমানে হয়ত তাই-ই আছে।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

ভ্রান্ত নীরিক্ষণ অনুপপত্তি

কোন একটি বস্তু বা ঘটনা ঠিক যে ভাবে আছে বা ঘটে সেভাবে তাকে না দেখে আমরা যদি ভুল করে অন্যভাবে দেখি, তাহলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ বলে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি। আমরা আসলে যা প্রত্যক্ষ করি তাকে তা না ভেবে অন্য কিছু বলে ধারণা করি। ভ্রান্ত নিরীক্ষণ সদর্থক জাতীয় অনুপপত্তি। কেননা, এখানে কোন একটি বিষয় আমাদের নিরীক্ষণের মধ্যে উপস্থিত থাকে, কিন্তু বিষয়টিকে আমরা ভুলভাবে নিরীক্ষণ করি। যেমন-কোন একটি স্টেশনে লাইনের উপর দু'টি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একটি ট্রেনের একজন যাত্রী তার ট্রেনটি ছাড়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। হঠাৎ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাঁর ট্রেনটি চলতে শুরু করেছে এবং তিনি কিছুটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। আসলে ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন রকম। তাঁর নিজের ট্রেনটি সেখানে ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে এবং অপর ট্রেনটিই চলতে শুরু করেছে। অথচ তিনি ভুল করে নিজের ট্রেনটিকেই চলতে দেখলেন। এক্ষেত্রে তিনি যে ভুল করলেন তাকেই বলা হয় ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

ভ্রান্ত নীরিক্ষণ অনুপপত্তি

খ. ২। সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ (Universal Mal-Observation) :

ভ্রান্ত নিরীক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে সার্বজনীন হতে পারে। যখন সবাই মিলে কোন একটি ভুল করে তখন তাকে সার্বজনীন ভ্রান্ত-নিরীক্ষণ বলে। যেমন-সূর্যকে উদিত হতে এবং অস্ত যেতে দেখা একটি সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ। কেননা এ ভুল আমরা সবাই করি। বাস্তবে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। তাই আমরা সবাই ভুল করে সূর্যকে উদিত হতে ও অস্ত যেতে দেখি।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

অনিরীক্ষণ ও ভ্রান্ত নিরীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য

আরোহের কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে যে সব বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ করা দরকার সেগুলো যদি নিরীক্ষণ না করা হয়, তাহলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে বলে অনিরীক্ষণ। অনেক সময় নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত বা প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরীক্ষণ না করেই একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করে বসি। ফলে এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- কয়েকজন প্রতিভাবান লোকের খারাপ হাতের লেখা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সব প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখাই খারাপ। এখানে যে সব প্রতিভাবান লোকের হাতের লেখা ভাল তাদেরকে নিরীক্ষণ থেকে বাদ রাখা হয়েছে। কাজেই এখানে অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তের অ-নিরীক্ষণ ঘটেছে।

অপরপক্ষে, কোন একটি বস্তু বা ঘটনা ঠিক যেভাবে আছে বা ঘটে সেভাবে তাকে না দেখে আমরা যদি ভুল করে তাকে অন্যভাবে দেখি, তাহলে যে অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে তাকে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ বলে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি। আমরা আসলে যা প্রত্যক্ষ করি তাকে তা না ভেবে অন্যকিছু বলে ধারণা করি। যেমন-একটি লোক গোধূলি লগ্নে পথ চলার সময় পথের উপর একটি দড়ি দেখে তাকে সাপ বলে ভুল করলো। এখানে দড়িকে সাপরূপে দেখা একটি ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

অনিরীক্ষণ ও ভ্রান্ত নিরীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য

অ-নিরীক্ষণ একটি নঞর্থক জাতীয় অনুপপত্তি। এখানে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিরীক্ষণের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। অনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে নিরীক্ষণ করা হয়।

পক্ষান্তরে, ভ্রান্ত নিরীক্ষণ একটি সদর্থক জাতীয় অনুপপত্তি। এখানে কোন একটি বিষয় আমাদের নিরীক্ষণের মধ্যে উপস্থিত থাকে। কিন্তু বিষয়টিকে আমরা ভুলভাবে নিরীক্ষণ করি।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঘটনাবলীকে নিজেদের আয়ত্তে এনে কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষ করাকে বলা হয় পরীক্ষণ।

পরীক্ষণ এক প্রকারের নিরীক্ষণ। নিরীক্ষণের বেলায় নিরীক্ষিত বস্তু বা ঘটনা আমাদের চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমাদের চেষ্টার দ্বারা কোন বস্তুকে উৎপাদন করে বা কোন ঘটনাকে ঘটিয়ে নিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করবার নামই পরীক্ষণ। পরীক্ষণের বেলায় ঘটনাবলীর উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এতে আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কোন একটি ঘটনাকে কৃত্রিম উপায়ে ঘটিয়ে নিয়ে তাকে যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করি। ঘটনাবলী ঘটার জন্য প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকি না। যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড বলেন, "পরীক্ষণ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত এবং জ্ঞাত অবস্থাবলীর ভিত্তিতে নিরীক্ষণ।"১ যুক্তিবিদ্যার বিশিষ্ট গ্রন্থকার কালিদাস সেন বলেন, কৃত্রিমভাবে আমাদের উৎপন্ন পরিবেশের অধীনে ঘটনাবলীর সুশৃঙ্খল প্রত্যক্ষণকেই পরীক্ষণ বলা হয়।"

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ, একজন রসায়নবিদ তার গবেষণাগারে নির্দিষ্ট অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একসাথে মিশিয়ে তাতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহ করে পানি উৎপন্ন করেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবস্থাবলী তার আয়ত্তের মধ্যে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি সবই তার নাগালের মধ্যে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যে পানি উৎপন্ন হয় তিনি তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই ঘরে বসে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পানি উৎপন্ন করছেন। তিনি তার সুবিধামত যতবার ইচ্ছা ততবারই কাজটি করতে পারেন। সুতরাং গবেষণাগারে পানি উৎপন্ন করবার প্রক্রিয়াটি একটি পরীক্ষণ।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

পরীক্ষণের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্মন্ধে নিম্নের তথ্যগুলোর সন্ধান পাই:

১। পরীক্ষণ এক প্রকারের উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ।

পরীক্ষণ সব সময়ই উদ্দেশ্যমূলক। পরীক্ষণের বেলায় পরীক্ষণকারীর মনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন এবং সেখানে পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পরীক্ষণ সম্ভব নয়। যেমন-একজন পরীক্ষণকারী যখন গবেষণাগারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে মিশ্রণ ঘটান তখন তিনি অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা করেন।

২। পরীক্ষণে কৃত্রিমভাবে ঘটনাকে সৃষ্টি করা হয়।

পরীক্ষণের বেলায় যে বিষয় বা ঘটনাকে পরীক্ষণ করা হয় সেটিকে কৃত্রিম পরিবেশে সৃষ্টি করা হয়। বস্তু বা ঘটনা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না। এখানে সৃষ্ট ঘটনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে তাকে প্রত্যক্ষ করা হয়। কাজেই পরীক্ষণ একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ। এতে আমরা একটি ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে পারি। তাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে তার গুণাগুণ লক্ষ্য করতে পারি। ফলে পরীক্ষণের সাহায্যে পরিচালিত যে কোন অনুসন্ধান কাজে আমরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারি।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৩। পরীক্ষণে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা যায়।

পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষণীয় বিষয়ের উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাই আমরা যতবার ইচ্ছা ততবার ঘটনাকে ঘটিয়ে নিতে পারি। আর আমাদের সুবিধামত একই ঘটনার উপর পুনঃ পুনঃ পরীক্ষণ কার্য চালাতে পারি। একজন রসায়নবিদ গবেষণাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একসাথে মিশিয়ে তার ইচ্ছামত বারবার পানি উৎপন্ন করতে পারেন। আবার বিভিন্ন ধাতুর উপর নাইট্রিক এসিডকে প্রয়োগ করে জানা যায় যে, এ এসিডটি লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি সব ধাতুকেই গলিয়ে দেয়, কিন্তু একমাত্র সোনাকে গলাতে পারে না।

৪। পরীক্ষণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায়।

পরীক্ষণের বেলায় নির্বাচিত ঘটনাকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ঘটিয়ে নিয়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ঘটনাটিকে অপরিবর্তিত রেখে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। এভাবে বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিবেশে কোন ঘটনাকে পরীক্ষণ করে নিশ্চিত ফল লাভ করা যায়।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৫। পরীক্ষণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষণ একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ। এতে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় প্রত্যক্ষ করা হয়। এসব বিষয় প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তি ও দৈহিক শক্তি যথেষ্ট নয়। তাই স্বাভাবিক শক্তিকে বর্ধিত করবার জন্য পরীক্ষণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। যেমন-চোখের শক্তিকে বর্ধিত করবার জন্য আমরা অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করি।

৬। পরীক্ষণে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করা হয়।

পরীক্ষণ একপ্রকার বিশ্লেষণমূলক প্রত্যক্ষণ। প্রকৃতিতে অনেক বস্তু বা ঘটনাই জটিল। এখানে একটি বস্তু বা ঘটনা অন্যান্য বস্তু বা ঘটনার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। এদের একটিকে অপরগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে তাকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাই পরীক্ষণে জটিল ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য থেকে নির্বাচিত বিষয়কে পৃথক করে ফেলা হয়। যেমন- বাতাস একটি মিশ্র পদার্থ। এর মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন প্রভৃতি উপাদান মিলেমিশে থাকে। শুধুমাত্র অক্সিজেনের উপর পরীক্ষণ চালাতে গেলে প্রথমেই বাতাসকে বিশ্লেষণ করে অক্সিজেনকে পৃথক করা দরকার। সুতরাং পরীক্ষণ বিশ্লেষণধর্মী।

আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৭। পরীক্ষণের সাহায্যে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঘটনা আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা ইচ্ছামত তাকে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি; ঘটনাটিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে বিভিন্নভাবে যাচাই করে নিতে পারি। তাই এর থেকে নিশ্চিত ফলাফল পাওয়া যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

টপিক – ১০ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

টপিক ০৯: আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

আরোহ অনুমানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তুগত সত্যতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের সাহায্যে বাস্তব ঘটনাবলি থেকে আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে উক্ত কাজটি করবার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে নিরীক্ষণের চেয়ে পরীক্ষণের সুবিধা এবং কয়েকটি বিষয়ে নিরীক্ষণের চেয়ে পরীক্ষণের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। আবার কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষণের চেয়ে নিরীক্ষণের সুবিধা এবং কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষণের চেয়ে নিরীক্ষণের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ঐগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো-

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

(১) নিরীক্ষণের পরিসর পরীক্ষণ থেকে ব্যাপক।

প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে ঘটিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষণের বেলায় যে সব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পরীক্ষণ খুব কম ক্ষেত্রে সম্ভব। কিন্তু সে তুলনায় নিরীক্ষণ অনেক বেশি ক্ষেত্রে সম্ভব। কেননা নিরীক্ষণের জন্যে ঘটনাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। যেমন-চন্দ্র গ্রহণ, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাটা, কাল বৈশাখী ইত্যাদি ঘটনার বেলায় পরীক্ষণ সম্ভব নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে আমরা অবাধে নিরীক্ষণের আশ্রয় নিতে পারি। তাছাড়া, কতকগুলো ক্ষেত্রে পরীক্ষণ চালানো খুবই বিপজ্জনক। যেমন-মানুষের দেহের উপর সাপের বিষের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষণ করে দেখা সম্ভব নয়। একটি জীবন্ত মানুষের দেহে ঐ বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করি। অর্থাৎ কোন লোককে বিষধর সাপে কামড়ালে তার উপর বিষের ক্রিয়া নিরীক্ষণ করি। সুতরাং নিরীক্ষণের ক্ষেত্র পরীক্ষণ থেকে প্রশস্ততর।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা

(২) নিরীক্ষণে আমরা কারণ থেকে কার্য এবং কার্য থেকে কারণ উভয় দিকেই গমন করতে পারি। কিন্তু পরীক্ষণে শুধুমাত্র কারণ থেকে কার্যে গমন করতে পারি, কার্য থেকে কারণে গমন করতে পারি না। আরোহ অনুসন্ধানে আমাদেরকে কোন সময় একটি জ্ঞাত কারণের কার্য খুঁজে বের করতে হয়। আবার কোন সময় একটি জ্ঞাত কার্যের কারণ খুঁজে বের করতে হয়। নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা একটি জানা কার্যের কারণ আবিষ্কার করতে পারি। যেমন- একজন লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলো। আমরা এ রোগের কারণ আবিষ্কার করতে চাই। এক্ষেত্রে আমরা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীকে নিরীক্ষণ করে জানতে পারি যে, মশার কামড় হচ্ছে এ রোগের কারণ। আবার নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা একটি জানা কারণের কার্য আবিষ্কার করতে পারি। যেমন-কোন একটি স্থানে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। আমরা এ কারণের কার্য আবিষ্কার করতে চাই। আমরা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত স্থানটি ঘুরে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে এর থেকে উৎপন্ন ক্ষয়ক্ষতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হই।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা

অপরপক্ষে, পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা কেবল একটি কারণ থেকে তার কার্যকে আবিষ্কার করতে পারি। একটি কার্য থেকে তার কারণ আবিষ্কার করতে পারি না। যেমন-পরীক্ষণের সাহায্যে একটি ইঁদুরের দেহে বিষ প্রয়োগ করবার পর ইঁদুরটি মারা গেল। এখানে বিষরূপ কারণ থেকে তার মৃত্যুরূপ কার্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু একটি মরা ইঁদুর আমাদের সামনে হাজির করলে আমরা পরীক্ষণের সাহায্যে সরাসরি এর কারণ আবিষ্কার করতে পারি না। এক্ষেত্রে আমরা একটি পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন করি। অর্থাৎ, আমরা মৃত্যুর একটি কারণ আন্দাজ করি এবং এ জাতীয় মৃত্যুর কোন লক্ষণ ঐ মৃতদেহে আছে কিনা তা পরীক্ষণ করি। যদি থাকে তাহলে তাকেই মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য করি। এখানে আমরা কার্য থেকে সরাসরি কারণের দিকে গমন না করে কারণ থেকে কার্যের দিকে গমন করে পরোক্ষভাবে মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করি। সুতরাং, পরীক্ষণে কার্য থেকে সরাসরি কারণে পৌঁছানো যায় না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা

(৩) নিরীক্ষণ পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়।

নিরীক্ষণের বেলায় কোন বিষয় বা ঘটনা প্রকৃতিতে যেভাবে থাকে বা যেভাবে ঘটে আমরা সেভাবেই তাকে প্রত্যক্ষ করি। এ কাজে আমরা আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তিকে ব্যবহার করি। বিষয়বস্তুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি না। সুতরাং নিরীক্ষণ পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়। অপরদিকে, পরীক্ষণের বেলায় বিষয়বস্তু ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটা পূর্ব ধারণা থাকা দরকার। এ ধারণা আমরা নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাপ্ত হই। সুতরাং পরীক্ষণ নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

(৪) নিরীক্ষণের কোন বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন নেই।

নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতিতে অবস্থিত কোন বস্তু বা প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপন্ন কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি। এর জন্য বিশেষ ধরনের কোন পরিবেশের প্রয়োজন হয় না। আমরা যে কোন অবস্থায় যে কোন বিষয়বস্তুকে নিরীক্ষণ করতে পারি। কিন্তু পরীক্ষণে সেরূপ হয় না। এতে বিষয়বস্তু ও তার পরিবেশের উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নইলে পরীক্ষণ সফল হয় না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা

(৫) নিরীক্ষণের স্থান পরীক্ষণের আগে।

নিরীক্ষণ পরীক্ষণের পথকে সুগম করে দেয়। যে ঘটনাটির উপর পরীক্ষণ চালাতে হবে তার সম্মন্ধে আমাদের একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। এ জ্ঞান না থাকলে আমরা পরীক্ষণ শুরু করতে পারি না। এ প্রাথমিক জ্ঞান আমরা নিরীক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করি। সুতরাং পরীক্ষণের আগে নিরীক্ষণের প্রয়োজন, কিন্তু নিরীক্ষণের জন্যে পরীক্ষণের কোন প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষণের কোন সাহায্য না নিয়েও আমরা একটি ঘটনাকে নিরীক্ষণ করতে পারি।

(৬) পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া।

পরীক্ষণ একটি জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। এতে যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টার পর একটি ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে ঘটানো সম্ভব হয়। পরীক্ষণ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এর জন্যে অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যেখানে সেখানে যার তার উপর পরীক্ষণ চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু নিরীক্ষণ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ঘটনাকে নিরীক্ষণ করতে পারি। কাজেই সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরীক্ষণই বেশি সুবিধাজনক। -

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১। পরীক্ষণের মত নিরীক্ষণে নির্বাচিত ঘটনাকে বারবার উপস্থাপন করা যায় না।

নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনাবলীর উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এখানে কোন ঘটনা ঘটার জন্য প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই প্রকৃতিতে যখনই কোন ঘটনা ঘটে তখনই কেবল তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব। আমরা যদি চন্দ্রগ্রহণ নিরীক্ষণ করতে চাই, তাহলে প্রকৃতিতে ঘটনাটি ঘটার জন্য আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আমরা আমাদের ইচ্ছামত ঘটনাটিকে বারবার ঘটিয়ে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে পারি না।

২। পরীক্ষণের মত নিরীক্ষণে আমরা ধীর স্থিরভাবে নির্বাচিত ঘটনাকে নিরীক্ষণ করতে পারি না। নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনাবলী আমাদের আয়ত্তের বাইরে থাকে। আমরা নিজেরা কোন ঘটনাকে ঘটিয়ে নিতে পারি না। আমরা কেবল প্রকৃতি প্রদত্ত ঘটনাকেই নিরীক্ষণ করি। তাই প্রকৃতিতে কোন ঘটনা ঘটলে তার জন্য যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যেই তাড়াহুড়া করে কাজ সেরে নিতে হয়। আমরা যদি ভূমিকম্পকে নিরীক্ষণ করতে চাই তাহলে সময়ের অভাবে ধীরে সুস্থে সতর্কতার সাথে কাজ করতে পারি না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধা

৩। পরীক্ষণের মত নিরীক্ষণে নির্বাচিত ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পরীক্ষণে ঘটনাবলীর উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাই নির্বাচিত ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু নিরীক্ষণে সেটা সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে ঘটনাবলী খুবই জটিল অবস্থায় থাকে। সাধারণত একটির সাথে অন্যটি মিলেমিশে থাকে। নিরীক্ষণের বেলায় কোন ঘটনা প্রকৃতিতে যেভাবে থাকে বা ঘটে ঠিক সেভাবেই তাকে নিরীক্ষণ করতে হয়।

৪। পরীক্ষণের মত নিরীক্ষণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না।

নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঘটনা আমাদের আয়ত্তাধীনে থাকে না। তাই এতে সুবিধামত পরিবেশ পরিবর্তন করা যায় না। নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্বাচিত ঘটনাকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা দরকার। পরীক্ষণে এ কাজটি সম্ভব, কিন্তু নিরীক্ষণে সম্ভব নয়। কেননা, নিরীক্ষণে প্রকৃতি প্রদত্ত ঘটনাকেই প্রত্যক্ষ করা হয়। কোন ঘটনাকে ঘটিয়ে নেওয়া হয় না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধা

৫। পরীক্ষণের মত নিরীক্ষণে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

পরীক্ষণের সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় কোন বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা হয়। ফলে এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু নিরীক্ষণে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে আমাদের যাভাবিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহ ধীর স্থিরভাবে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। কাজেই নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিশ্চিত নয়, বরং সম্ভাব্য।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

(১) পরীক্ষণের সাহায্যে ইচ্ছামত একই ঘটনাকে বারবার করে পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু নিরীক্ষণের সাহায্যে তা করা যায় না। পরীক্ষণের বেলায় নির্বাচিত ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কাজেই ফলাফল সম্মন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমরা যতবার ইচ্ছা ততবার একই ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করে তার উপর পরীক্ষা কাজ চালাতে পারি। একজন রসায়নবিদ গবেষণাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক সাথে মিশিয়ে তার ইচ্ছামত বারবার পানি উৎপন্ন করতে পারেন। কিন্তু নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনা ঘটার জন্যে প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যখনই প্রকৃতিতে কোন ঘটনা ঘটে তখনই কেবল তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব। চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা নিরীক্ষণ করতে চাইলে আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এসব ঘটনাকে আমাদের ইচ্ছামত যখন তখন নিরীক্ষণ করতে পারি না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

(২) পরীক্ষণের বেলায় আমরা ধীরস্থিরভাবে এবং সতর্কতার সাথে নির্বাচিত ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্তু নিরীক্ষণের বেলায় তা পারি না।

পরীক্ষণে নির্বাচিত ঘটনাটি আমাদের আয়ত্তাধীন থাকে। তাই আমরা দীর্ঘ সময় ধরে খুবই সাবধানতার সাথে কোন ঘটনাকে পরীক্ষা করতে পারি যাতে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ফল লাভ করা যায়। কিন্তু নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনাবলী আমাদের আয়ত্তের বাইরে থাকে। তাই প্রকৃতি দয়া করে আমাদের যেটুকু সময় দেয় তার মধ্যেই তাড়াহুড়া করে কাজ সেরে নিতে হয়। যেমন-ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনা নিরীক্ষণের সময় আমরা সময়ের অভাবে ধীরে সুখে কাজ করতে পারি না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

(৩) পরীক্ষণের সাহায্যে নির্বাচিত ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় কিন্তু নিরীক্ষণে তা যায় না।

প্রকৃতিতে ঘটনাবলী খুবই জটিল অবস্থায় বিরাজ করে। সাধারণত একটির সাথে অন্যটি এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে সচরাচর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায় না। কিন্তু নির্বাচিত ঘটনাকে অপরাপর ঘটনার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে না পারলে তার সম্মন্ধে সত্যিকার জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। নিরীক্ষণের সাহায্যে এ কাজ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র পরীক্ষণের সাহায্যেই একটি ঘটনাকে অপরাপর ঘটনা থেকে পৃথক করা যায়। কারণ এখানে ঘটনাবলীর উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। যেমন-একটি মোমবাতি খোলা হাওয়ায় জ্বলতে থাকে, কিন্তু বদ্ধ পাত্রের মধ্যে নিভে যায়। কেন এরূপ হয় তা পরীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন প্রভৃতি গ্যাস মিলেমিশে অবস্থান করে। পরীক্ষণের সাহায্যে এ সব গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি পাত্রে রাখা হলো। তারপর একটি জ্বলন্ত মোমাবাতিকে প্রতিটি পাত্রে ঢুকিয়ে দেখা গেল যে, শুধুমাত্র অক্সিজেনের পাত্রেই বাতিটি জ্বলে। অন্যগুলোর মধ্যে নিভে যায়। এ পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেল যে, অক্সিজেন আগুন জ্বলার কারণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

(৪) পরীক্ষণের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু নিরীক্ষণের সাহায্যে তা যায় না। নিরীক্ষণের বেলায় ঘটনা ঘটার জন্যে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এতে সুবিধামত পরিবেশ পরিবর্তন করা যায় না। অথচ পরিবেশ পরিবর্তন কোন ঘটনা সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভের একটি উত্তম পন্থা। পরীক্ষণের বেলায় নির্বাচিত ঘটনাকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ঘটিয়ে নিয়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। যেমন— বিভিন্ন ধাতুর উপর নাইট্রিক এসিডের প্রভাব কি তা জানা দরকার। পরীক্ষণের সাহায্যে এ এসিডকে বিভিন্ন ধাতুর উপর প্রয়োগ করে আমরা জানতে পারি যে, এ এসিড লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি সব ধাতুকেই গলিয়ে দেয়, কিন্তু একমাত্র সোনাকে গলাতে পারে না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

(৫) পরীক্ষণ একটি স্বনির্ভর প্রক্রিয়া, কিন্তু নিরীক্ষণ একটি নির্ভরশীল প্রক্রিয়া।
পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কোন বস্তু বা ঘটনা এবং তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন একান্তই অপরিহার্য। তাই একজন পরীক্ষণকারী তার নিজের সুবিধামত কোন বিষয়বস্তুকে পরীক্ষণ করতে পারেন। এজন্য তাকে অন্য কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেই একটি ঘটনা ঘটিয়ে নিতে পারেন এবং তার উপর যতবার ইচ্ছা ততবার, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পরীক্ষণ-কার্য চালাতে পারেন। কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা নেই। এতে কোন কিছু নিরীক্ষণ করার সময় প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। প্রকৃতিতে যখনই কোন ঘটনা ঘটে তখনই তাকে নিরীক্ষণ করতে হয়। তিনি নিজে কোন বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে নিতে পারেন না। এজন্য নিরীক্ষণ সবসময়ই প্রকৃতি-নির্ভর।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা

(৬) পরীক্ষণের সাহায্যে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু নিরীক্ষণের সাহায্যে তা যায় না। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করি। এতে নির্বাচিত ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই আমরা ঘটনা সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি না। ফলে এর - থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিশ্চিত হয় না। কিন্তু পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঘটনা আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা ইচ্ছামত তাকে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ঘটনাটিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে বিভিন্ন ভাবে যাচাই করে নিতে পারি। তাই এর থেকে নিশ্চিত ফলাফল পাওয়া যায়।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ-

১। নিরীক্ষণের মত পরীক্ষণের পরিসর ব্যাপক নয়।

পরীক্ষণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। কিন্তু প্রকৃতিতে বহু ঘটনা আছে যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে ঘটিয়ে নেওয়া যায় না। আবার এদের উপর নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই খুব কম ক্ষেত্রেই পরীক্ষণ সম্ভব। নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের পরিসর খুবই সংকীর্ণ। আর নিরীক্ষণের পরিসর সে তুলনায় খুবই ব্যাপক। কেননা, যে কোন ঘটনাই আমাদের সামনে আসুক, আমরা তাকেই নিরীক্ষণ করতে পারি। তার জন্য ঘটনাটির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধা

২। নিরীক্ষণের মত পরীক্ষণে কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায় না।

নিরীক্ষণের বেলায় প্রকৃতিতে কোন ঘটনা ঠিক যেভাবে ঘটে আমরা তাকে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করি। ঘটনার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবার দরকার হয় না। তাই আলোচ্য ঘটনা যদি কার্য হয়, তাহলে নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা তার কারণ খুঁজে বের করতে পারি। আবার আলোচ্য ঘটনা যদি কারণ হয়, তাহলেও নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা তার কার্য খুঁজে বের করতে পারি। অর্থাৎ আমরা কার্য থেকে কারণ এবং কারণ থেকে কার্য উভয়দিকেই গমন করতে পারি। কিন্তু পরীক্ষণে বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় বলে আমরা কেবল একটি কারণ থেকে সামনের দিকে তার কার্যকে আবিষ্কার করতে পারি। একটি কার্য থেকে পিছনের দিকে গিয়ে তার কারণকে আবিষ্কার করতে পারি না। কেননা নিয়ন্ত্রিত ঘটনা শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধা

৩। নিরীক্ষণ ছাড়া পরীক্ষণ সম্ভব নয়।

সরাসরি কোন ঘটনার উপর পরীক্ষণ সম্ভব নয়। পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। এ জ্ঞান না থাকলে আমরা পরীক্ষণ শুরু করতে পারি না। এ প্রাথমিক জ্ঞান আমরা নিরীক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করি। তাছাড়া, যখনই আমরা কোন বিষয়বস্তু পরীক্ষণ করি তখনই সাথে সাথে আমরা তাকে নিরীক্ষণ করি। তাই নিরীক্ষণকে বাদ দিয়ে পরীক্ষণ সম্ভব নয়। নিরীক্ষণ পরীক্ষণের পথকে সুগম করে। উল্লেখ্য, পরীক্ষণের সাহায্য না নিয়েও কোন ঘটনাকে নিরীক্ষণ করা যায়।

৪। নিরীক্ষণের মত পরীক্ষণ একটি সহজ সরল প্রক্রিয়া নয়।

নিরীক্ষণ একটি সহজ সরল প্রক্রিয়া। আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে আমরা খুব সহজে কোন ঘটনাকে নিরীক্ষণ করতে পারি। কিন্তু পরীক্ষণ একটি জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। এতে যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টার পর একটি ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে উপস্থাপন সম্ভব হয়। তাছাড়া পরীক্ষণ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এর জন্য অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যেখানে সেখানে যার তার উপর পরীক্ষণ চালানো সম্ভব নয়।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের পরীক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ই আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি। এদের মাধ্যমেই আমরা বাস্তব ঘটনাবলী সম্মন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিনিয়তই নানা রকমের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা এ সবের কারণ জানতে চাই। আর চাই বলেই বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ভাল করে পরীক্ষা করি। দু'টি ভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ পরীক্ষা কাজ চালানো সম্ভব। তাদের একটি হচ্ছে নিরীক্ষণ এবং অপরটি হচ্ছে পরীক্ষণ।

কোন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষ করাকে নিরীক্ষণ বলে। নিরীক্ষণের বেলায় প্রকৃতিতে ঘটনা যেভাবে ঘটে আমরা সেভাবেই তাকে প্রত্যক্ষ করি। কোন ঘটনা ঘটিয়ে নেওয়ার বা তাকে পরিবর্তন করে নেওয়ার কোন চেষ্টা করি না। মেঘলা দিনে আকাশে যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে তখন আমরা যদি তাকে মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করি, তাহলে সেটি হবে একটি নিরীক্ষণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের পরীক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ

অপরপক্ষে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঘটনাবলীকে নিজেদের আয়ত্তে এনে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষ করাকে পরীক্ষণ বলে। পরীক্ষণের বেলায় আমরা আমাদের সুবিধামত কোন ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে ঘটিয়ে নিয়ে তার উপর পরীক্ষা কার্য চালাই। যেমন-কোন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঘরে বসে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবার সময় আমরা যদি তাকে অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করি, তাহলে সেটি হবে একটি পরীক্ষণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ঘটনা ঘটার জন্য প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আর পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এখানে আমরা নিজেরাই কৃত্রিম উপায়ে কোন ঘটনা ঘটিয়ে নিয়ে তার উপর পরীক্ষা কার্য চালাই। প্রথম ক্ষেত্রে প্রকৃতি একটি ঘটনা ঘটায়, আমরা শুধু তাকে প্রত্যক্ষ করি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই কোন একটি ঘটনা ঘটাই এবং তাকে প্রত্যক্ষ করি। যুক্তিবিদ বেন যথার্থই বলেছেন, "নিরীক্ষণ হলো কোন ঘটনা আবিষ্কার করা, পরীক্ষণ হলো কোন ঘটনা তৈরি করা।”

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের পরীক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে কোন কোন যুক্তিবিদ বলেন যে, নিরীক্ষণ একটি-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (natural process) এবং পরীক্ষণ একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া (artificial process)। বক্তব্যটির তাৎপর্য হচ্ছে- প্রথম ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে সৃষ্ট ঘটনাকে আমরা আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ঘটনাকে আমরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বক্তব্যটি পুরাপুরিভাবে সত্য নয়। নিরীক্ষণ সব সময় প্রাকৃতিক নয়। এতে আমরা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয় ক্ষমতাকে সাহায্য করবার জন্যে অনেক যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন-চন্দ্রগ্রহণকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করি। আবার পরীক্ষণও সব সময় কৃত্রিম নয়। এতে আমাদের আয়ত্তাধীন কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে আমরা অনেক সময় আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তিকে ব্যবহার করি। যেমন-একজন মহিলা তার নিজের চেষ্টায় একটি নতুন খাবার রান্না করবার সময় তার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তিকে সাহায্য করবার জন্যে কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেন না।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের পরীক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ

যুক্তিবিদ স্টক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "নিরীক্ষণ একটি নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষণ একটি সক্রিয় অভিজ্ঞতা।"২ এ বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে- নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি বলে আমাদের তেমন কর্মতৎপর থাকতে হয় না। আমরা কিছুটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করি। কিন্তু পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে এনে খুবই চেষ্টা সহকারে কোন একটা ঘটনা ঘটাতে হয় বলে আমাদের খুব সক্রিয় ও কর্মতৎপর থাকতে হয়। কিন্তু এ বক্তব্যটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। পরীক্ষণের বেলায় আমাদেরকে সব সময় সক্রিয় থাকতে হয় একথা ঠিক। কিন্তু নিরীক্ষণের বেলায় যে আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি, তা ঠিক নয়। এখানেও আমরা যথেষ্ট সক্রিয় থাকি। কোন নির্বাচিত ঘটনাকে আমরা যথেষ্ট মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করি। অপ্রয়োজনীয় ঘটনাকে বর্জন করে প্রয়োজনীয় ঘটনার দিকেই মনোনিবেশ করি। নির্বাচিত ঘটনাটি প্রকৃতিতে কখন ঘটবে সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। সুতরাং নিরীক্ষণও একটি সক্রিয় অভিজ্ঞতা। তবে পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণ কম সক্রিয়।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণের পরীক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হলেও আসলে তাদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়ই আসলে একই জাতের। পরীক্ষণ এক প্রকারের নিরীক্ষণ। নিরীক্ষণ যখন খুব সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয় এবং যখন তাতে বেশিরভাগ কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া হয় তখনই তাকে আমরা পরীক্ষণ বলি। ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার মানসে আমরা সুবিধামত কোন সময় নিরীক্ষণের আশ্রয় নেই আবার কোন সময় পরীক্ষণের আশ্রয় নেই। নিরীক্ষণ থেকে পাওয়া ফলটিতে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে আমরা পরীক্ষণের সাহায্যে তাকে যাচাই করে নেই। আবার পরীক্ষণ চালাবার সময় তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আমরা নিরীক্ষণ করি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

তাছাড়া নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করি। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা কৃত্রিম পরিস্থিতির সাহায্য গ্রহণ করি। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা কম ও বেশি সক্রিয় থাকি। তবে নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণে আমাদেরকে বেশি সক্রিয় থাকতে হয়। নিরীক্ষণে অধিকমাত্রায় প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। আর পরীক্ষণে অধিকমাত্রায় কৃত্রিম পরিবেশের আশ্রয় নিতে হয়। তাই যুক্তিবিদ জেভন্স যথার্থই বলেছেন, "নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নয়।"

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ আরোহের বস্তুগত ভিত্তি

আরোহ অনুমানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তুগত সত্যতাকে অর্জন করা। এরূপ অনুমানে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই আমরা একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। বিশেষ দৃষ্টান্তগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা কোন সময় নিরীক্ষণের আশ্রয় নেই; আবার কোন সময় পরীক্ষণের আশ্রয় নেই। যেমন-নিরীক্ষণের সাহায্যে কয়েকটি = বিশেষ ক্ষেত্রে মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া রোগের আবির্ভাব ঘটতে দেখে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সকল ক্ষেত্রেই মশার কামড় হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। আবার পরীক্ষণের সাহায্যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগে পদার্থের আয়তন বাড়তে দেখে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সব ক্ষেত্রেই তাপ প্রয়োগে পদার্থের আয়তন বাড়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আরোহ অনুমানে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ আরোহ অনুমানের বাস্তব উপাদান ও মাল-মশলা সরবরাহ করে। নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্য সংগ্রহ করি। এ সব আশ্রয়বাক্য বাস্তব ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই প্রাপ্ত। কাজেই এগুলো বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে আশ্রয়বাক্যগুলোর বস্তুগত সত্যতার উপর এবং আশ্রয়বাক্যের বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের উপর। তাই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণকে আরোহের বস্তুগত ভিত্তি বলা হয়।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

নমুনা -১। রংপুরের চেয়ে ঢাকার মৃত্যু সংখ্যা বেশি। সুতরাং ঢাকা একটি অস্বাস্থ্যকর স্থান।

যুক্তির উৎস: এ যুক্তিটি আমাদের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরোহ অনুমানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ঘটনা যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজনীয় কোন বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ থেকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়। নিরীক্ষণের এ গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় যুক্তিটিতে নিরীক্ষণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: আলোচ্য যুক্তিটি অনুসারে আমরা গণনার মাধ্যমে জানতে পারি যে রংপুর শহরে প্রতি বছর যে পরিমাণ মানুষ মারা যায় তার চেয়ে ঢাকা শহরে প্রতি বছর-অধিক পরিমাণে মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ প্রতি বছর রংপুর শহর অপেক্ষা ঢাকা শহরে মানুষের মৃত্যু সংখ্যা বেশি। আমরা জানি যে পরিবেশ ও জলবায়ুর সাথে মানুষের মৃত্যুর একটা যোগসূত্র আছে। তাই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে যে ঢাকা একটি অস্বাস্থ্যকর স্থান।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

যুক্তির মূল্যায়ন: আলোচ্য যুক্তিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে কেবলমাত্র মৃত্যু সংখ্যা গণনা করেই ঢাকাকে একটি অস্বাস্থ্যকর স্থান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে ঢাকা ও রংপুরের তুলনামূলক লোকসংখ্যার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়নি। বাস্তবে রংপুরের লোকসংখ্যা কম। তাই সেখানে মৃত্যুর সংখ্যাও কম। আর ঢাকার লোকসংখ্যা বেশি। তাই সেখানে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। যুক্তিটিতে লোকসংখ্যার উপর গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র মৃত্যুর সংখ্যাকে গণনা করা হয়েছে। এখানে প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরীক্ষণ না করেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

অনুপপত্তির নামকরণ: সুতরাং প্রয়োজনীয় অবস্থাবলীর অনিরীক্ষণ ঘটায় যুক্তিটিতে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি দেখা দিয়েছে।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

নমুনা-২। আমরা প্রতিদিন সূর্যকে উদিত হতে ও অস্ত যেতে দেখি। সুতরাং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

যুক্তির উৎস: এ যুক্তিটি আমাদের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে কোন বস্তু বা ঘটনা ঠিক যেভাবে আছে বা ঘটে তাকে সেভাবে নিরীক্ষণ করবার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার। নিরীক্ষণের এ প্রয়োজনীয় শর্তটি অনুসরণ না করে নিরীক্ষণীয় বস্তুকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ায় যুক্তিটিতে নিরীক্ষণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তিটি অনুসারে আমরা নিরীক্ষণ করি যে, সূর্য প্রতিদিন সকালে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়, সারাদিনে আকাশ অতিক্রম করে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। রাত শেষে আবার পরদিন সকালে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় এবং একই প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

যুক্তির মূল্যায়ন : আলোচ্য যুক্তিতে সূর্যকে উদিত হতে এবং অস্ত যেতে দেখার ব্যাপারটি একটি ভ্রান্ত নিরীক্ষণ। আমরা জানি যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রীয় নক্ষত্র এবং পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। আপেক্ষিকভাবে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী (সূর্যকে প্রদক্ষিণরত অবস্থায়) নিজ অক্ষে (পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে) আবর্তন করে। তাই আমরা সবাই ভুল করে সূর্যকে উদিত হতে এবং অস্ত যেতে দেখি। এ ভুলটি কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বরং এটি একটি সার্বজনীন ভ্রান্তি।

অনুপপত্তির নামকরণ : সুতরাং নিরীক্ষণীয় বস্তু ও ঘটনাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ায় আলোচ্য যুক্তিতে সার্বজনীন ভ্রান্ত্র নিরীক্ষণ অনুপপত্তি দেখা দিয়েছে।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

নমুনা-৩। পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবার পূর্বে আমি একটি কুৎসিত মুখ দেখেছিলাম। তাই আমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে।

যুক্তির উৎস: এ যুক্তিটি কার্য-কারণ সম্পর্কের একটি ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারে কারণ হচ্ছে কার্যের পূর্বগামী ঘটনা। তবে যে-কোন পূর্বগামী ঘটনাকেই কারণ বলা চলে না। কারণ হতে গেলে কার্যের সাথে তার একটা অনিবার্য সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়টি অগ্রাহ্য করায় যুক্তিটিতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তিটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বক্তা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবার পূর্বে হলের সামনে একজন কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট মানুষের দর্শন লাভ করে। তারপর সে হলে প্রবেশ করে পরীক্ষা দেয়; কিন্তু ঐদিন তার পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায়। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সে পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তের ঘটনার সাথে একটা যোগসূত্র খুঁজে পায় এবং সিদ্ধান্ত স্থাপন করে যে, কুৎসিত মুখ দর্শনই হচ্ছে তার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কারণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

যুক্তির মূল্যায়ন: আলোচ্য যুক্তিটিতে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবার পূর্ব মুহূর্তে একটি কুৎসিত মুখ দর্শন অবশ্যই একটি পূর্ববর্তী ঘটনা। তবে এটি নিতান্তই আকস্মিক ও অবান্তর। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সাথে ঘটনাটির কোন যোগসূত্র থাকতে পারে না। অর্থাৎ ঘটনা দুটির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। একটি তালগাছে কাকের আগমনকে যেমন তাল পতনের কারণ বলা চলে না। তেমনই এ যুক্তিতে কুৎসিত মুখ দর্শনকে পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কারণ বলে ভাবা যায় না। কেননা এসব ঘটনার মধ্যে কোন আনিবার্য সম্পর্ক থাকে না। আর অনিবার্য সম্পর্কবিহীন দুটি ঘটনাকে কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ করা যায় না।

অনুপপত্তির নামকরণ: আলোচ্য যুক্তিতে কুৎসিত মুখ দর্শন ও পরীক্ষা খারাপ হওয়া নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। এরূপ দুটি ঘটনাকে কার্য-কারণ সম্পর্কে অবদ্ধ করায় যুক্তিতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

নমুনা-৪। একজন রোগী নতুন স্থানে যাওয়ার পর তার রোগ সেরে গেল। সুতরাং নতুন স্থানের আবহাওয়াই তার রোগ মুক্তির কারণ।

যুক্তির উৎস : এ যুক্তিটি কার্য-কারণ নিয়মের ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আমরা জানি যে কারণ হচ্ছে সদর্থক ও নঞর্থক শর্তসমূহের সমষ্টি। কার্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেকটি শর্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান থাকে। আলোচ্য যুক্তিতে এ দিকটি অগ্রাহ্য করায় এতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত ত্রুটির উদ্ভব ঘটেছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: এ যুক্তি অনুসারে একজন লোক দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তিনি. রোগমুক্ত হতে পারছিলেন না। এরূপ অবস্থায় আবহাওয়া পরিবর্তনের মানসে তিনি পূর্বের অবস্থান ত্যাগ করে নতুন স্থানে গমন করলেন। নতুন স্থানে যাবার পর তার রোগ সেরে গেল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে নতুন স্থানের আবহাওয়াই তার রোগমুক্তির কারণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

যুক্তির মূল্যায়ন: আলোচ্য যুক্তিটিতে শুধুমাত্র আবহাওয়াকেই রোগমুক্তির সমগ্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আবহাওয়া একটি মাত্র শর্ত। রোগমুক্তির পিছনে আরও কিছু শর্ত কাজ করেছে। লোকটি ঠিকমত ওষুধ ও পথ্য খেয়েছে। তাকে যথাযথ সেবা দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি নতুন স্থানের আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের অনুকূলে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে ওষুধ, পথ্য, সেবা, আবহাওয়া, ইত্যাদি সবগুলো শর্ত একত্রে কাজ করে রোগীর রোগমুক্তি ঘটিয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র আবহাওয়াকেই রোগমুক্তির কারণ বলা চলে না।

অনুপপত্তির নামকরণ : আলোচ্য যুক্তিতে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি মাত্র শর্তকে সমগ্র কারণ বলে ভুল করায় এতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ঘটেছে।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

নমুনা-৫। নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযানই তার পতনের কারণ।

সূচনা: এ যুক্তিটি কার্য-কারণ নিয়মের একটি ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে। আমরা জানি যে কারণ হচ্ছে কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। কার্য ঘটার কেবলই আগে কারণ ঘটে। কারণ ও কার্যের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান থাকে না। এ গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি অনুসরণ না করায় আলোচ্য যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তিটি অনুসারে মহা পরাক্রমশালী নেপোলিয়ন, দিগ্বিজয়ের এক পর্যায়ে রাশিয়া অভিযানে যান। অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার পর তার পতন ঘটে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে রাশিয়া অভিযানই নেপোলিয়নের পতনের কারণ।

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

বৈধতা বিচার

যুক্তির মূল্যায়ন: এ যুক্তিতে একটি দূরবর্তী শর্তকে কারণ বলে ধারণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া অভিযান নেপোলিয়নের পতনের একটি দূরবর্তী ঘটনা। রাশিয়া অভিযান তাঁর জীবনে এক ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছিল একথা সত্য। কিন্তু এ অভিযানের পর আরও বহু ঘটনা ঘটে যায় যেগুলো তাঁর পতনের সাথে যুক্ত। অভিযানের পর দেশবাসী যদি মস্কো শহরকে পুড়িয়ে না দিত, যদি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করত, তাহলে হয়ত ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন দিকে চালিত হত। তাই রাশিয়া অভিযানের মত একটি দূরবর্তী ঘটনা নেপোলিয়নের পতনের কারণ হতে পারে না।

অনুপপত্তির নামকরণ: এ যুক্তিতে একটি দূরবর্তী শর্তকে কারণ বলে ধারণা করায় এতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ঘটেছে।

THANK YOU